ভালোবাসো, বাঁচো

আনিসুল হক

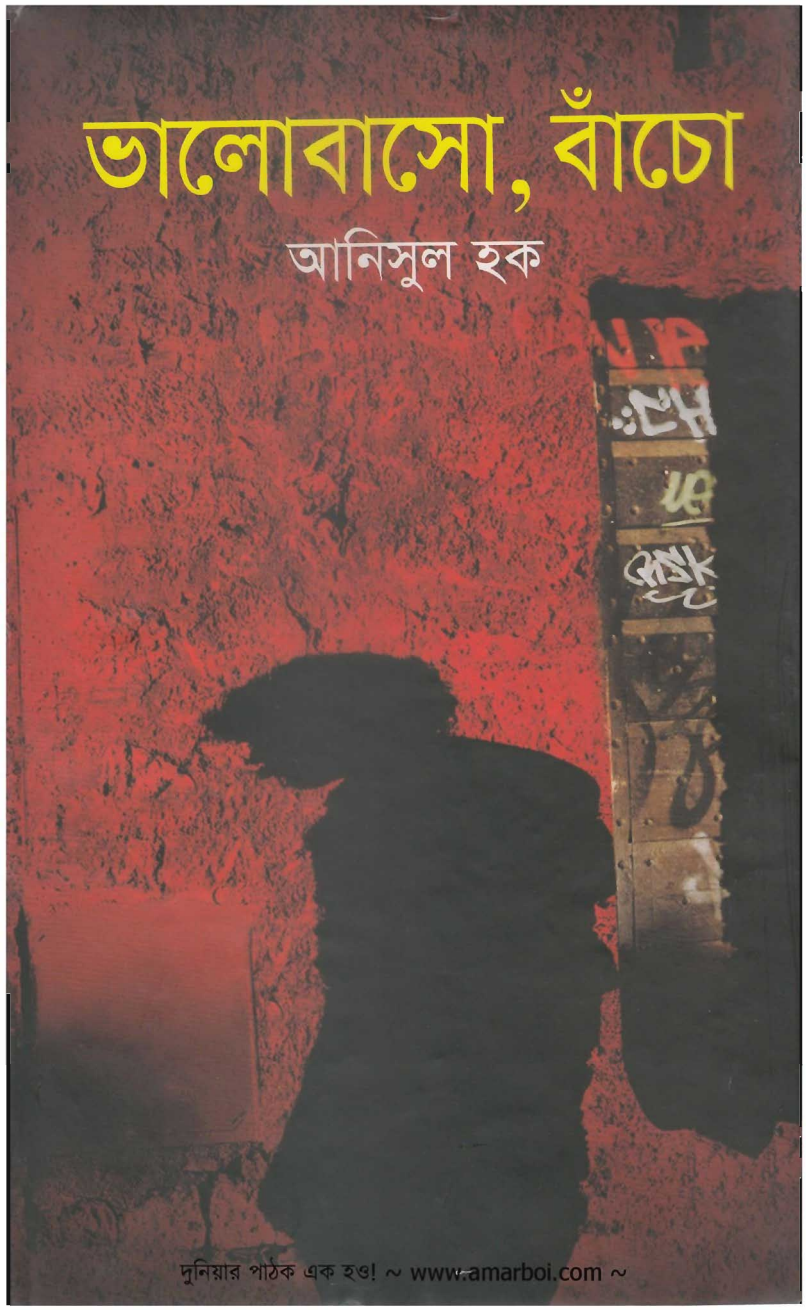

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ এক আশ্চার্য গল্প। শুরু হয় খুন দিয়ে। আক্কাস মাহমুদ ওরফে আকাশ এই গল্পের নায়ক এবং কথক। সে বলছে, সে একটা খুন করেছে। খুন করে সে ছুটে চলেছে পুলিশ স্টেশনে। ধরা দেবার জন্য। আস্তে আস্তে জানতে পারি আকাশের জীবনের নানা পরত। সে ভালোবাসে কাবেরিকে। তার বন্ধুর নাম রাশেদ। এই রাশেদকেই সে খুন করেছে। কারণ রাশেদ অপমান করেছে আকাশের প্রেমিকা কাবেরিকে আর মাকে।

মা? আকাশ অপছন্দ করে তার মাকে। কেন?

সেই আকাশই তার মায়ের কাছে ফিরে আসে। কারণ মা তাকে জন্ম দিয়েছিল সমাজের নিয়মকানুন ভেঙে। মার কারণেই সে পেয়েছিল এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ।

এই কাহিনি পড়া শেষ করে চোখের জল ধরে রাখা মুশকিল। জীবনের প্রতি এক অপূর্ব ভালোবাসায় পাঠকের মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

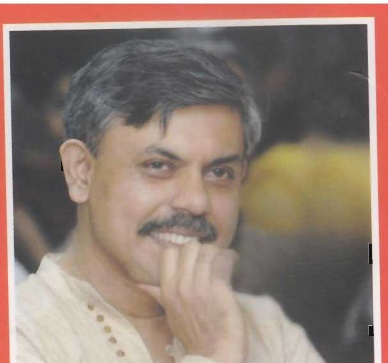

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মোঃ মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা—নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়।

মা ইংরেজিতে 'ফ্রিডম'স মাদার' নামে অনূদিত ও দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। উড়িষ্যা থেকেও ওড়িশি ভাষায় বেরিয়েছে *মা*-এর অনুবাদ।

সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, সিটি ব্যাংক আনন্দআলো পুরস্কার, খালেকদাদ চৌধুরী পদক, খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল [illegible] আমার কাছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসো, বাঁচো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসো, বাঁচো

আনিসুল হক

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসো, বাঁচো

প্রকাশক
শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ৭১১৮৪৪৩, ৮১১২৪৪১
Email: gyankoshprokashoni@gmail.com,
gk_tarafder@yahoo.com

একুশে বই মেলা ২০১৪

স্বত্ব
লেখক

মেকাপ
বিশ্বজিৎ দাস

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণে
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্
১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা।
ফোন: ৯৬৬৭৯১৯

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN:978-984-90538-7-3

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

কালি ও কলমের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় আবুল হাসনাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো কথা

প্রথমে ছিল গল্প। সমকালের সাহিত্য পাতার সম্পাদক মাহবুব আজিজ চেয়েছিলেন, ঈদসংখ্যার জন্য, কিছু না ভেবে লিখতে বসেছিলাম। একটা কিছু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই প্লটটা নিয়েই ঈদসংখ্যা প্রথম আলোর জন্য উপন্যাস লিখতে বসা। এখানে সেটাই থাকল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সামান্য ঘষামাঁজা।

প্রকাশকের হাতে তুলে দেবার আগে আবার পড়লাম। চোখে জল চলে এলো। দুনিয়াটা আসলেই সুন্দর। এবং মায়াময়। বেঁচে থাকা আসলেই এক মধুর ব্যাপার।

আনিসুল হক

৭ জানুয়ারি ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একটা খুন করি।

খুন করে রক্তাক্ত ছুরি আর রঞ্জিত জামা-কাপড়-চেহারা নিয়ে আমি হাজির হই রমনা থানায়। থানার প্রবেশপথে দুজন রাইফেলধারী পুলিশ প্রহরারত। রোদ্দুরে তাদের ছায়া দুটোকে লম্বা দেখায়। রাইফেলের ডগায় রোদ পড়ে ঝিলিক দেয়। সম্ভবত তারা তেল মেখে রেখেছে বন্দুকের নলে। আমি তাদের অতিক্রম করি অবহেলায়, তারাও আমার প্রতি কোনো রকম মনোযোগ দেয় বলে মনে হয় না। আমি তাদের ছায়া দুটোকে মাড়িয়ে এগুতে থাকি। আমার নিজের ছায়ার হাতে একটা ছুরির ছায়া দেখে আমার বুকটা সামান্য কেপে ওঠে। এতক্ষণ এই পুরোটা পথ আমি দৌড়েছি, পথে কোনো মানুষ আমার গতিরোধ করেনি। কেউ আমাকে দেখে চিৎকার করে ওঠেনি। আমাকে অনুসরণ করেনি। কেউ কেউ পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। আমার পিঠে চোখ নেই যে আমি জানব, তারা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল কি না। থানার বারান্দা পেরিয়ে প্রথম ঘরটাতে আমি যাই। আমার স্যান্ডেল ধূলিমাখা বারান্দায় আওয়াজ তোলে।

একজন পুলিশ কর্তা টেবিলের অপর পারে বসে আছেন। তার সামনে চায়ের কাপ। পিরিচে টোস্ট বিস্কুট। এক পাশে কতগুলো খাতা। একটা নীল রঙের মাছি একটা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় বসে আছে। পুলিশ কর্তা বাঁ হাতে তাকে তাড়িয়ে দেন।

'আমি খুন করছি। আমাকে গ্রেপ্তার করেন'–কথা কটা বলতে আমাকে ভাষা খুঁজে ফিরতে হয় না, যদিও এতটা পথ দৌড়ে আসার ফলে আমি হাঁপাতে থাকি।

পুলিশ কর্তা চা খাচ্ছেন। তিনি টোস্ট বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলেন, 'আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন, বসেন। চা খাবেন? এই মজিদ, আরেক কাপ চা দিতে বলো। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেন না!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হয়, লোকটার গালে কষে একটা চড় মারি। আমি এইমাত্র একটা খুন করে এলাম, আর লোকটা আমাকে, মানে একটা খুনিকে, বসতে বলছে, চা খেতে বলছে!

আমি বলি, 'আপনি বোধ হয় আমার কথা ভালো করে শুনতে পান নাই, আমি একটা খুন করছি।'

পুলিশ কর্তার বুকে লেখা শমসের, শমসের বলেন, 'আপনি বোধ হয় আমার কথা ভালো করে শোনেননি, আমি আপনাকে বসতে বলেছি। আপনার জন্য চা আসছে।' তিনি তাঁর চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে একটা চামচ দিয়ে পেয়ালা থেকে বিস্কুটের তলানি তুলে নিয়ে মুখে পোরেন।

আমি বলি, 'আমি চা খাব না। ওকে, আপনি চা খান। টোস্ট বিস্কুট দিয়ে চা খান। সিগারেট খাবেন? আমার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আছে। নেন। খান'–আমি প্যান্টের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাঁর সামনে ধরি। আশ্চর্য, প্যাকেটের গায়েও রক্ত লেগে আছে।

পুলিশ কর্মকর্তার এই নির্লিপ্ততা আমার অসহ্য লাগে। ঠিক করি, আমি বসব না। পালিয়ে যাব।

আমি থানা থেকে বের হব বলে ঘুরে দাঁড়াই। থানা বিল্ডিংয়ের বারান্দা পেরিয়ে এই রুমটা প্রথম রুম। দেয়ালে অনেক মানুষের ছবি, ফটোর নিচে নাম লেখা, এরা সবাই দাগি আসামি। এই তালিকায় আমার নাম নাই। থাকবার কথাও নয়। আমি এই খুনটা করার আগে খুন করি নাই। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। আজ আষাঢ়ের প্রথম দিন, পেপারে কদমফুলের ছবি ছাপা হয়েছে। ফ্যানের বাতাসে টেবিলের ওপরে খবরের কাগজের পাতা কদমফুলের ছবিসহ কাঁপছে। আজ বৃষ্টি হয় নাই। বেশ ভাপসা গরম। আমার গায়ের জামায় রক্ত ছাড়াও ঘামের দাগ।

আমি ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াই। নিজের পায়ের শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠি। দরজা পেরিয়ে বারান্দায় পা রাখি। এই সময় একটা প্রচণ্ড থাবা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে, আমার কলারের পেছনটা চলে যায় কারও মুঠোয়। আমাকে জুডোর একটা প্যাঁচে কেউ ধরাশায়ী করে ফেলে এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে আমাকে মেঝেতে ফেলে রাখে। একটু পরে মেঝেতে ছেঁচড়িয়ে আমাকে একটা সেলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলে আমি ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে হাত বোলাই। আমার কপালের কাছটাও ছিলে গিয়ে থাকবে। হাত বুলিয়ে কপালের ক্ষতটার পরিমাণ অনুভব করার চেষ্টা করি।

এত কিছুর দরকার ছিল না। আমি তো ধরা দেব বলেই এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি খুন করেছি। খুন করে রক্তাক্ত ছুরি হাতে চলে এসেছি থানায়। আমার ছুরিটা কি ওরা ঠিকভাবে সংগ্রহ করেছে? আমাকে শাস্তি দিতে হলে ওই ছুরিটা ওদের দরকার হবে।

মেঝেতে বসে দেয়ালে পিঠ রেখে একজন কনস্টেবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি–'শুনেছেন, আমার ছুরিটা...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ঘটনা মগবাজার রেললাইন বস্তির। পুরো বস্তিটাতেই উৎকট গন্ধ। কিন্তু আমার মতো গঞ্জিকাসেবী মানুষের জন্য এই গন্ধ কোনো ব্যাপারই না। আমি শুয়ে আছি আসলাম রিকশাওয়ালার ডেরায়। সে আমাদের ফেনসিডিলের সঙ্গী ও সরবরাহকারী। একটা দেয়ালের ওপর কতগুলো পলিথিন তাঁবুর মতো করে টানিয়ে বস্তিঘরটা বানানো। পাশেই রেললাইন। মাঝে মধ্যে ট্রেন যায়। তখন সবাই রেললাইন থেকে সরে যায় ঠিকঠাক। ট্রেন চলে যাওয়ার পর আবার রেললাইনটা বস্তিবাসীর আঙিনা হয়ে ওঠে। মুরগি কুকুর ছাগল চড়ে। বাচ্চারা হিসু করতে বসে যায় রেললাইনের ওপরেই। পলিথিনে ঢাকা ছোট ছোট অন্ধকার ডেরায় একটা করে সংসার। ওই পাশে মহিলারা রাঁধছেন। ধোঁয়া উঠছে চুলা থেকে, হাঁড়িপাতিলের তল থেকে। ভাপ উঠছে হাঁড়ির মুখ থেকে। বেশির ভাগ পুরুষই কাজের সন্ধানে চলে গেছে। নারীদেরও কেউ কেউ বাইরে। কেউ কেউ বাড়িতে। ঘরকন্না করছে। বাচ্চারা সব স্বাধীন। আসছে যাচ্ছে। চিৎকার করছে, কাঁদছে, হাসছে, খেলছে। বৃদ্ধারা বসে উকুন মারছেন।

এরই মধ্যে একটা কাঁথাবালিশ বিছানো নোংরা বিছানায় আমি শুয়ে আছি।

আসলাম আমাকে ফেনসিডিলের বোতল দিয়ে যায় তিনটা। প্যান্টের পকেট থেকে দোমড়ানো-মোচড়ানো কতগুলো টাকা বের করে তার হাতে দিই।

একটা বোতলের ছিপি খুলি। বিছানায় বসে মুখে ঢালি ভেতরের তরল। এই কফের সিরাপের গন্ধটাই আমার শরীরে একধরনের আনন্দের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

প্রথম বোতলটা শেষ করি গোগ্রাসে। কারণ, এটা নেওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। শরীরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়টা খোলার আগেই রাশেদ এসে ঝুপড়িটায় ঢোকে। ঘরে ঢুকতে তাকে মাথা নিচু করতে হয়। বাইরে আলো, ঘরের ভেতরটা ছায়ান্ধকার। ঘরের ছোট্ট প্রবেশপথটায় রাশেদের উবু হওয়া ছায়ামূর্তি।

একটা সিগারেট জ্বালাই। জোরে টানি। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলি, রাশেদ, আয়। মাল আছে?

রাশেদ বলে, আসলাম আসতেছে। অসুবিধা নাই।

আমি বলি, আয়, আমারটা দিয়া শুরু কর।

আমরা দুজনে দুটো বোতল খুলি। ফেনসিডিলের বোতলের মুখের খাপটা ঘোরাতে যে কী সুখ!

রাশেদ দ্রুত বোতলের ছিপি খোলে। তার শরীর কাঁপছে। গলগল করে সে পুরোটা ঢেলে দেয় মুখে।

আমি আস্তে আস্তে মুখে ঢালি। সিগারেটে ফুঁ দিই। রাশেদ আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে টান দেয়।

আসলাম আসে, আরও চারটা বোতল রেখে যায়।

রাশেদ বলে, আসলাম ভাই, তুমি এত ভালো কেন, আসলাম ভাই। সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আসলামকে জড়িয়ে ধরে। চকাস চকাস করে সে আসলামের না-কামানো গালের আধা ইঞ্চি দাড়িতে চুমু খায়।

আসলাম বলে, টাকা কিন্তু পাই নাই।

রাশেদ বলে, কবে টাকা তোমারে না দিয়া ভাগছি কও। চুরি করি, চামারি করি, তোমার টাকা তো ঠিকই দেই। দেই না, কও?

রাশেদ ছেলেটা বেঁটে, আর আসলাম লম্বা, দুজনেই রোগাপাতলা। রাশেদ পরে আছে জিনসের প্যান্ট, ওপরে একটা খুব ময়লা টি-শার্ট, কোনো কালে এর রং সাদা ছিল, আর রিকশাওয়ালা আসলামের গায়ে একটা সবুজ শার্ট, সেটা ঘামে ভেজা, আর পরনে লুঙ্গি, কোমরে একটা গামছাও বাঁধা। রাশেদ ফরসা, তার লম্বাটে মুখ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সে কারণেই তাকে অতটা বেঁটে মনে হয় না, এখন যেমনটা লাগছে, আসলামের পাশে। আসলাম লম্বা, সামনের দিকে ধনুকের মতো ঝুঁকে দাঁড়ায়, তাতেও তার লম্বাত্ব কমে না।

আসলাম রাশেদের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

রাশেদ বলে, তোর কাবেরির খবর কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দুজনেই নেশায় চুর। রাশেদ আমার পাশে শুয়ে আছে। তার ওপরে এক পা তুলে দিয়ে ইংরেজি এল-এর মতো করে বসে আছি একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। রাশেদ আমার বাল্যবন্ধু।

নেশার ঘোরে আমার মনে পড়ে, আসলাম আমাকে বলেছিল, রাশেদ কাবেরিকে রেইপ করার চেষ্টা করেছিল।

আসলাম ঠিক রেইপ কথাটা বলে নাই। বলেছে, আপনার বন্ধু তো কাবেরি আপারে জোরাজুরি করছে। কাবেরি আপা তারে লাথি মাইরা তারপর গেছে গা!

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল, জানার জন্য কাবেরিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডিড হি ট্রাই টু রেইপ ইউ।

কাইন্ড অফ! কাবেরি বলেছিল।

মানে কী?

বাদ দে? হি ওয়াজ লোডেড দেন। একেবারে আনকনশাস ছিল। আমি তো অরে মাইরা তক্তা বানায়া ছাড়ছিলাম।

নাহ্। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। আসলাম বলেছিল, রাশেদ জোরাজুরি করছে। তার মানে এই নয় যে সে রেইপ করার চেষ্টাই করেছে। কাবেরি বলেছিল, কাইন্ড অফ।

আসলে ব্যাপারটা কী?

আমরা দুজনে, আমি আর রাশেদ, আসলামের বিছানায় পড়ে আছি। নেশায় বুঁদ। মেঘের ওপরে যেন শুয়ে আছি। আমি এক পা তুলে দিই রাশেদের গায়ে। দোস্ত, তুই কি কাবেরিকে রেইপ করার চেষ্টা করছিলি?

রাশেদ বলে, রেইপ করব কেন? আপসে হইলে কেউ রেইপ করে?

আমি ওকে জড়িয়ে ধরি, এইটা তো তুই জানসই, কাবেরির সাথে আমার অ্যাফেয়ার।

রাশেদ আমার গায়ে হাত রেখে বলে, কাবেরি তো একটা খানকি।

নেশার ঘোরে আমার শরীর এলিয়ে পড়ছে, কিন্তু এ কথা শোনার পরে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা যায় না, আমি খেপে যাই, বলি, তোর মুখের ভেতর...ঢুকায়া দিমু।

রাশেদ বলে, আমি কি কথাটা মিছা কইলাম? তুইও জানস, আমিও জানি, হেও জানে, হে শরীলটা বেইচা আমগো লাইগাই ট্যাহা আনে।

জড়ানো জিবে আমার বাক্য আসতে চায় না, মুখ দিয়ে থুতু ছিটাতে ছিটাতে আমি বলি, হেইডা তো আনে নেশার লাইগা। নাইলে কি আর আনত? হারামজাদা, আমি প্রমিজ করলাম, আইজ থাইকা নেশা ছাইড়া দিমু। কাবেরিরেও নেশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ামু। দুইজনেই রিহাবে যামু। ছয় মাস পরে ভালা হইয়া গিয়া দুইজনে বিয়া করুম।

রাশেদ বলে, ভালাই হইব। তুই একটা খানকির পোলা। আরেকটা খানকিরে বিয়া করবি।

আসলামের রুমে একটা ছুরি আছে। মাঝারি সাইজ। এটা দিয়ে আম কাটা যাবে, আবার মানুষও খুন করা যাবে। বেড়ার গায়ে নীল পলিথিনের ওপরে ছুরিটার বাঁটের স্ক্রু 'ঃ' এর মতো ফুটে আছে। আমার চোখ তার ওপরে পড়ে।

আমি বলি, রাশেদ, শুন, আমার মায়েরে খানকি কইছস। আরেকবার কইলে ওই ছুরিটা দেখছস, এইটা আমি স্ট্রেইট তোর প্যাডে ঢুকায়া দিমু।

সে বলে, গাঞ্জা কাটা ছুরির ভয় দেখায়া লাভ নাই। তোর মা যে খানকি, আর তুই যে জাউরা পোলা, এইডা তুইও জানস, আমিও জানি।

আমার শরীর চলে না। তবু হাতে ঠেস দিয়ে আস্তে করে উঠি। ছুরিটা শক্ত করে ধরি বাঁ হাতে। ডান হাতে ওর কান বরাবর গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে একটা ঘুষি মারি। তারপর দুই হাতে ছুরির বাঁট ধরে ওর বুক বরাবর ঢুকিয়ে দিই। ঠিক যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, সেখানটাই টার্গেট করি। আমার শরীরে তখন অসুরের শক্তি এসে ভর করে।

রক্তের একটা ফিনকি আমার মুখে এসে পড়ে।

আমি তো এমনিতেই বেহুঁশ। তার ওপর রক্ত দেখে উন্মত্ততা বাড়ে। আমি ছুরিটা টেনে তুলে এবার ওর পেট বরাবর ঢোকাই আর বের করি।

রক্তে বিছানাটা ভিজে যায়।

বিছানাটার ভেতরে একটা গর্ত করে দিলে রক্ত সেখানে জমা হতে পারত, ঘেমে-নেয়ে একাকার আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ভাবি। আমার ক্লান্তি লাগে।

রাশেদ কিছুক্ষণের মধ্যেই গোঙানি বন্ধ করে।

সমস্ত ঘরে নীরবতা। শুধু মাথার ওপরে একটা ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরছে। তার শব্দ কানে এসে লাগে।

আমি বুঝতে পারি, আমি খুন করেছি। আমি একজন খুনি।

রাশেদ আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওকে খুন করতে চাইনি। একসঙ্গে নেশা করলে যে বন্ধন গড়ে ওঠে, তা সাধারণত ছেঁড়ে না। রাশেদকেও আমি ভালোই বাসতাম। কিন্তু ও এমন কথা বলল আমার নেশাতুর শরীরে আর মনে আগুন জ্বলে উঠল, মাথা ঠিক থাকল না, হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ওকে খুনই করে ফেললাম।

না। আমি খুনি হতে চাইনি। খুন যখন করেই ফেলেছি, এখন উচিত থানায় যাওয়া। আমি উঠে পড়ি। রক্তাক্ত ছুরি হাতে নিয়ে ছুটতে থাকি থানার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

কাবেরির সঙ্গে আমার দেখা আকস্মিকভাবে।

কাঁটাবনের ফুল আর পোষা পাখির মার্কেটের উল্টো দিকে পথটা নেমে গেছে ঢালু হয়ে। একটা নেড়ি কুত্তা ঘেউ ঘেউ করছে, দোকানে বিক্রির জন্য রাখা কুকুরছানাগুলোর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্ভবত। পাখির দোকানে একটা ময়না পাখি তারস্বরে ডেকে ওঠে 'ময়না' 'ময়না' বলে।

আমি পাখির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পাখি দেখি, দুটো লাভ বার্ড পরস্পরকে চুম্বন করছে। নেড়ি কুত্তার ডাকে বিদেশি কুকুরছানাগুলোও ডেকে ওঠে। আমার ধারণা হয়, তারা ডাকছে ইংরেজিতে। কাজেই তাদের ডাককে ঘেউ ঘেউ বলা যাবে না, বলতে হবে, দে আর বার্কিং।

কাঁটাবনের ঢালটা যেখানে নেমে গেছে, সেখানে একটা বস্তি আছে। ওই বস্তির সামনেই একজন বৃদ্ধা আসবেন, মনে হবে একজন ভিখিরিনি, তাঁকে সবাই ডাকে বকুলের মা বলে। তাঁর ভিক্ষার থলে থেকে বের হবে গাঁজা ভরা সিগারেটের প্যাকেট।

বকুলের মা আসছেন না। আমি ওখানে দুবার চক্কর দিয়েছি। ওখানে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান। আমি সেখানে যাই। চায়ের অর্ডার দিই।

তখনই একটা রিকশা এসে দাঁড়ায়। রিকশা আরোহিণীর দিকে আমার চোখ যায়। মেয়েটা হালকা-পাতলা, গায়ে একটা সাদা ধরনের কামিজ আর একটা নীল পাজামা, চুল এলোমেলো, চোখের চাহনি বিভ্রান্ত। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মেয়েটি কী চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি বলে-- ঠিক আমাকে উদ্দেশ করেই বলে কি না, নিশ্চিত নই; কারণ, চায়ের দোকানে দোকানি ছিল একজন, আর খদ্দের ছিল দু-চারজন-- 'এইখানে বকুলের মাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

আমি বলি, বকুলের মায়ের জন্য আমিও ওয়েট করতেছি।

মেয়েটি বলে, আমার খুব আর্জেন্ট। ওনাকে একটু খুঁজে আনেন না, প্লিজ। বস্তির ভিতরে গিয়ে একটু খোঁজ করেন না।

আমি বলি, আর্জেন্ট হলে আপনি নিজেই কেন যান না? চায়ের কাপের ভেতরে সর পড়ে আছে, আমি সেদিকে মনোযোগ দিই।

মেয়েটি রিকশা থেকে নামে। তার স্যান্ডেলের এক পাটি বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। সেটা হাতে তুলে নিয়ে কিছু একটা পরখ করে সে। তারপর রিকশাভাড়া না দিয়েই এক পায়ের স্যান্ডেল ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বস্তির ভেতরে ঢুকে যায়।

একদল পিচ্চি দৌড়ে আসে বস্তির ভেতর থেকে। তারা হল্লা করে। তাদের হাতে একটা ইঁদুর। লেজটাকে সুতা দিয়ে বেঁধেছে। এখন সেটার পেছনে একটা খেলনা গাড়ি বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ইঁদুর ছুটলে গাড়িও ছুটবে, এই হলো তাদের উদ্দেশ্য।

আমি কাপের চা শেষ করি। একটা সিগারেট ধরাই। কিন্তু গাঁজার নেশা আমার শরীরে টান ধরাচ্ছে। অস্থির লাগছে। জিব শুকিয়ে আসছে। আমার এখন গাঁজা দরকার। সবকিছু অসহ্য বলে মনে হচ্ছে।

দ্রুত প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাই আমি। দোমড়ানো-মোচড়ানো কয়টা টাকা চাওয়ালার দিকে ছুড়ে দিই।

তারপর বালকদের হল্লা ভেদ করে বস্তির ভেতরে ঢুকে পড়ি।

মানুষের বসবাস এখানে। দুই পাশে ঘরবাড়ি, ছাপরা-ছই, টিনের ঘর, ইটের ছাপরা, কালো দেয়াল, পলিথিন মোড়ানো বেড়া। কিন্তু সর্বত্র মানুষের বসবাসের চিহ্ন। বিছানা-বালিশ-কাঁথা। কালো, পুরোনো আসবাব, কত ধরনের কৌটা, টেলিভিশন, শোকেস, ড্রেসিং টেবিল। কী নেই। হাঁড়িকুঁড়ি, রোদ্দুরে মেলে দেওয়া কাপড়, ভেজা কাঁথা। চুলা, চুলার ওপরে হাঁড়ি, আগুন, কেরোসিনের গন্ধ, তরকারির মসলাদার ঘ্রাণ। কুকুর-বেড়াল-ছাগল। পোস্টার। সিনেমার, রাজনীতির। আমি মাথা বাঁচিয়ে এগোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন প্যান্ট-শার্ট পরা তরুণ বেরিয়ে যাচ্ছে হনহনিয়ে, তাকে জিজ্ঞেস করি, বকুলের মাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

সে একটা গলি আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়। সেই গলিটা পুরোটাই পলিথিনে ঢাকা। নীল পলিথিন, সাদা পলিথিন জোড়া ছাউনি। তবু গলিপথে এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। সেই জলমগ্ন জায়গাগুলোয় ইট বিছানো। আমি ইটের ওপর সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে থাকি।

বকুলের মায়ের ডেরাটা খুঁজে পেতে লোকের সাহায্য আর নিতে হয় না। কারণ, আমার নাসারন্ধ্র গন্ধ পেয়ে যায়। ঘাস পুড়ছে, ধোঁয়া উড়ছে–এই গন্ধ আমাকে টানে, আমি যেন কুকুর, নাক টেনে টেনে গন্ধ নিচ্ছি আর এগিয়ে যাচ্ছি।

একটা পলিথিন ঢাকা ডেরায় ঢুকে পড়ি।

সেখানে দেখি, ওই মেয়েটি বসে আছে। সামনে আরেকজন জটাধারী। তারা কল্কে ভাগাভাগি করে টানছে। আমি গিয়ে সোজা তাদের পাশে বসে পড়ি আর হাত বাড়িয়ে দিই। তারা আমার হাতে পালাক্রমে কল্কে তুলে দেয়। আমি টানি আর আস্তে আস্তে আকাশে উড়তে থাকি। গেরুয়া রঙের আকাশে। হলুদ রঙের বাতাসে। ভাসছি। ভাসছি।

আমি বলি, তোমার নাম কী?

সে বলে, কাবেরি।

আমি বলি, কাবেরি, তুমি খুব সুন্দর। জীবনেও আমি এত সুন্দর মেয়ে দেখিনি।

কাবেরি হাসতে থাকে। আমি তার সঙ্গে হেসে উঠি। জটাধারীও হাসতে থাকে।

এই ডেরাটায় এখন হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে।

কাবেরি আমার উরুতে চাপড় দিয়ে বলে, এই, এত হাসির কী হলো?

ও নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ে আমার কাঁধে। আমি তার চুলের গন্ধ পাই। গাঁজার গন্ধের চেয়ে সেটা কোনো অংশে খারাপ লাগে না।

দারুণ তো। আমি গান গাই, আহা, কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে...

জটাধারী কাশি দেয়। কাবেরি বলে, তোমার নাম কী? আমি বলি, আমার নাম আকাশ। সে বলে, তাহলে আমার নাম বাতাস। আজি কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হো হো করে হাসি।

সে বলে, সবকিছু কেমন ঢেউয়ের মতো নড়তেছে। আনন্দে সব দুলতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

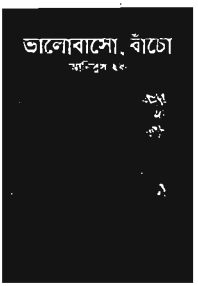

চার

রাশেদের সঙ্গে দেখা সেই বিকেলেই। আজিজ সুপার মার্কেটের সিঁড়িতে। চারতলার পেছন দিককার এই সিঁড়িটা সারাক্ষণই অন্ধকার আর নির্জন। রাশেদ সিঁড়িতে বসে আছে। সঙ্গে আরও তিনজন তরুণ। আমি চপ্পলে শব্দ তুলে সেখানে যাই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ক্লান্তি লাগে।

রাশেদ আমাকে দেখে ডেকে ওঠে, 'আকাশ। আসছিস? আয়। বস।'

আমি রাশেদের পাশে বসি।

সে বলে, 'দোস্তো। পকেটে তো মাল নাই। আইজকা চলব কেমনে?'

'মাল নাই কেন? তুই না পরীক্ষায় ফি তুললি?'

'এক পরীক্ষার ফি দিয়া কয় দিন চলব?'

'সব উড়াইছস। অহন বুঝ।'

'বুঝাবুঝির কিছু নাই। টাকা তো জোগাড় করন লাগবই।'

'কেমনে করবি?'

'যেমনে করি।'

রাশেদ টাকা জোগাড় করার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। এই ব্যাপারে আমাদের কৌশল মোটামুটি অভিন্ন ও বহুলচর্চিত। টাকা ধার করা ও ফেরত না দেওয়া। এ জন্য আমরা নতুন নতুন ফন্দি বের করি।

রাশেদ বলে, চল, টাকার ধান্দায় বাইর হই।

আইজকা কোন দিকে যাবি? আমি জিজ্ঞেস করি।

চল, বুয়েটের দিকে যাই।

চল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশেদ আর আমি হাঁটতে থাকি। ভ্যাপসা গরমে দুজনের সেদ্ধ হওয়ার জোগাড়। রাশেদ বলে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। চল রিকশা নিই।

আমি বলি, আমার পকেটে টাকা নাই।

রাশেদ বলে, আমার পকেটেও নাই। তাই বলে কি আমরা এই গরমের মধ্যে হাঁটব নাকি? এই রিকশা, দাঁড়ান।

একটা রিকশা দাঁড়ায়। রাশেদ লাফিয়ে উঠে পড়ে। রিকশাওয়ালা বলে, কই যাইবেন।

রাশেদ বলে, এই তো সামনে।

রিকশাওয়ালা বলে, সামনে যামু না।

রাশেদ বলে, তাহলে পেছনে যাও।

রিকশাওয়ালা বলে, আমার রিকশার ব্যাক গিয়ার নাই। আপনে কই যাইবেন, সেইটা কন না কেন?

রাশেদ বলে, এই তো আহসানউল্লাহ হল। পলাশী।

রিকশাওয়ালা বলে, ওই দিকে যামু না।

রাশেদ খেপে যাচ্ছে। এখনই সে রিকশাওয়ালার কলার ধরে ফেলবে। আমার পাশে বসা রাশেদের তপ্ত মাথার ঝাঁজ যেন আমার কানে এসে লাগছে।

আমি তার ধাবন্ত হাতকে নিবৃত্ত করি, বলি, আমরা যাব, আবার আসব। কাজেই ভাড়া নিয়া আপনার চিন্তা নাই।

রিকশাওয়ালা বলে, পুরা কুড়ি টাকা দেওন লাগব।

রাশেদ বলে, কুড়ি না, বাইশ টাকা দিমু। চলো তো।

রিকশা চলতে শুরু করলে হাওয়া এসে লাগে চোখে-মুখে। ঘর্মাক্ত শরীরে বাতাস একটা শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

রাশেদ গান ধরে, নিশীথে যাইও ফুলবনে...

আমরা আহসানউল্লাহ হলের সামনে রিকশা দাঁড় করাই।

দ্রুত নেমে যাই। রাশেদ রিকশাওয়ার উদ্দেশে বলে, আমরা যাব, আর আসব। তুমি জাস্ট দুইটা মিনিট খাড়াইবা।

হলটা ভীষণ বড়। পুরোনো আমলের ভবন। আমার বুয়েটের বন্ধুরা এই হলের নাম দিয়েছে হসপিটাল। এর স্থাপত্যের প্রাচীনতা হয়তো তার কারণ। আমরা শীতল প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠি। লম্বা করিডর পেরিয়ে ৩০৫ নম্বর রুমে যাই। এ রুমে আমাদের একটা বন্ধু থাকে। তমাল। সে ভীষণ ভালো ছাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার রুমে গিয়ে আমরা উঁকি দিই। সে এই বিকেলবেলাতেও টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছে। ঘরে আর কেউ নাই। বিকেলবেলায় কারও থাকার কথাও নয়। সবাই সাধারণত বিকেলবেলা বাইরে যায়, চা খায়, গল্পগুজব করে, কেউ কেউ কমনরুমে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলে, কেউ বা টিউশনি করতে যায়। তমাল আমাদের স্কুলফ্রেন্ড, তার মুখে ব্রণ, গালে সামান্য দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা এবং তার চুল উস্কখুস্ক। গরমের জন্যই বোধ হয়, তমালের গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি।

রাশেদ বলে, তমাল। আকাশের তো মা মারা গেছে। তাকে গ্রামের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা লাশ রেখে এসেছি। ১২০০ টাকা দরকার। ৬০০ টাকা জোগাড় করা গেছে। আর ৬০০ দরকার। তুই কি আমাকে ৬০০ টাকা ধার দিতে পারবি? ওর মামা বাইরে গেছে। কালকে আসবে। তোকে আমরা পরশু দিনই টাকাটা দিয়ে দিতে পারব।

তমালের চোখে-মুখে এখনো পড়ার ঘোর। সে যেন এই দুনিয়াতে নাই। সে বলে, ৬০০ টাকা! আমার কাছে তো মনে হয় ৬০০ টাকাই আছে। সব টাকা দিয়ে দিলে চলব কী করে।

রাশেদ বলে, কালকের দিনটা কোনো রকমে চালা দোস্ত। পরশু তো আমি তোকে টাকা দিয়ে দেবই। নিজে এসে দিয়ে যাব। আকাশের মামা আমার হাতেই টাকাটা দেবে আশা করি।

তমাল ওঠে। টেবিলে পড়ে থাকা চাবির গোছা নিয়ে লকার খোলে। ড্রয়ার থেকে বের করে দেয় ৫০০ টাকার একটা নোট, আর একটা এক শ টাকা।

আমাকে জড়িয়ে ধরে তমাল বলে, তোর মায়ের জন্য দোয়া করব। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন।

আমি কাঁদতে থাকি। শুরুটা অভিনয়ের কান্নাই ছিল। কিন্তু শেষটা আর অভিনয়ের কান্না থাকে না। কী যেন একটা ব্যথা বুক ঠেলে আমার গলায় এসে আটকে যায়। কেঁদে সেই ব্যথার দলাটাকে সরাতে চাই। আমার দুই চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরে। তমালের কাঁধ ভিজে যায়।

তমালের চোখেও জল আসে। সে চশমা খুলে চোখ মোছে।

আমরা বিদায় নিই।

রাশেদ বলে, রিকশাওয়ালাটা বেশি ভাব লইছিল। অরে ভাড়া দিমু না। চল।

আমি বলি, কেন, আমাদের কাছে তো টাকা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তমাল বলে, ওরে বাইশ টাকা দিলে আর থাকব কী!

আহসানউল্লাহ হল থেকে বেরোনোর অন্য রাস্তা আছে। পেছন দিকে। সেই গেট দিয়ে বেরিয়ে আমরা চলে যাই।

রিকশাওয়ালার কথা ভুলে যাই বেমালুম।

আমরা বকশীবাজার হয়ে চানখাঁরপুল যাই। ওখানে ভালো ফেনসিডিল পাওয়া যায়। আজকে ফেনসিডিল খেতে হবে। আজকে আমাদের ইনকাম ভালো। আরেকটা রিকশা নিই। এই রিকশাওয়ালাকে ডবল ভাড়া দেওয়া উচিত। আমি রাশেদকে বলি, উই উইল পে হিম ডাবল, ওকে।

ওকে। দোস্ত, রাশেদ বলে, তুই যে এত ভালো অ্যাকটিং জানস, এইটা তো জানা আছিল না।

মানে কী? আমি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করি।

রাশেদ বলে, তুই তমালের সামনে কী রকম কান্নাটা কান্দলি। দুই চোখ দিয়া একেবারে ওয়াসার ফুটা টাংকির মতোন পানি পড়ল।

আমি বললাম, অ্যাকটিং করি নাই। মার কথা মনে হইল। মারে কত দিন দেখি না। আমার জনমদুঃখিনী মা। তাই জেনুইনলি কান্দলাম। আইজকা মার শোকে বেশি কইরা গিলতে হইব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

কাবেরিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

কাবেরির সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি ছুটে যাচ্ছি কাঁটাবন বস্তির ডেরায়। যেখানে গঞ্জিকার আসর বসে। কালকে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হঠাৎ করেই। আর্ট কলেজের পুকুর পাড়ে। আমি তখন পুকুরের পাড়ে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলাম। কোত্থেকে ও এল, বলল, কী করো?

আমি বললাম, আকাশ দেখি।

ও বলল, আকাশ কেন আকাশ দেখবে? আয়না দেখলেই তো হয়।

আমি ঘাড় ঘোরালাম। দেখলাম কাবেরি।

কাবেরি! তুমি এখানে?

কাবেরি বলল, কেন, এখানে কি আমার আসতে নাই?

তারপর বর্ষার আকাশ কালো হয়ে এল। শুরু হলো বৃষ্টি। কাবেরি আমার হাত ধরে টানতে লাগল। চলো ওই ঝাঁকড়া গাছটার নিচে। ওই গাছের নিচে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে না। ওটাকে আমরা বলি, ছাতাগাছ।

ছাতাগাছ, নাকি ছাতিমগাছ?

ছাতাগাছ।

আমরা সেই ছাতাগাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

কী যে বৃষ্টি শুরু হলো। কোথাও ব্যাঙ ডাকছে। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। আর্ট ইনস্টিটিউটের মধ্যে ব্যাঙের ডাক কোত্থেকে আসবে? দুজনে যেন একটা দ্বীপে বসে আছি। চারদিকে জল। কেমন যেন লাগছে। গাছের পাতার ফাঁক গলে এক ফোঁটা দুই ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছে। আমাদের বৃত্তটাকে ছোট করে ফেলছে বৃষ্টির অপ্রতিরোধ্য ধারা। আমরা ঘন হয়ে বসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাবেরির শ্বাসের শব্দ আমার কানে আসছে। বৃষ্টির শব্দ বাতাসের শব্দ ভেদ করে আমি ওর হৃৎপিণ্ডের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি। ওর শরীরের উষ্ণতা আমাকে উষ্ণ করছে। আমরা একটু একটু করে ভিজে যাচ্ছি। ওর হলুদ জামা, কালো ওড়না, কালো পাজামা ভিজে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁচ্ছে ও। সাদা হাতের তালুতে বৃষ্টির ফোঁটা। আমিও হাত বাড়িয়ে ওর হাতের বৃষ্টির ফোঁটা স্পর্শ করি।

ও বলে, আমার হাত ভেজা। তুমি তোমার হাতটা মুছে নাও। আমার ব্যাগে হাত ঢোকাও। একটা স্টিক আছে। ধরাও।

আমি ওর ব্যাগে হাত দিই। একটা সিগারেট পাই। সেটায় আগুন ধরাই। তাকে দিই টানতে। আমরা দুজনে ভাগ করে একটা স্টিক খাই। ভেতরে ঘাস ভরা।

চারদিকে বৃষ্টি। মাথার ওপর থেকে দু-এক ফোঁটা পাতা চোয়ানো জল পড়ছে। এই রকম একটা অপার্থিব পরিবেশে দুজন গাঁজায় টান দিচ্ছি। আমরা যেন স্বর্গে আছি।

শলাকাটা শেষ হয়ে এলে কাবেরি বলল, আর তো নাই? তাই না?

আমি বললাম, না, আর নাই।

কাবেরি বলল, আমি এখন বৃষ্টিতে ভিজব।

আমি বললাম, আমিও ভিজব।

সে বলল, আমরা আলাদাভাবে ভিজব। একসঙ্গে না।

বললাম, আচ্ছা, একসঙ্গে না। তুমি আগে আগে যাও। আমি পরে যাব। কিন্তু মনে রেখো, আমরা দুজন একই আকাশের নিচে একই বৃষ্টিতে ভিজছি।

সে বলল, তুমি খুব সুন্দর কথা বলো।

তারপর সে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যেতে লাগল।

তার বৃষ্টিভেজা প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার আর ভিজতে ইচ্ছা করছে না। কথা ছিল, একই আকাশের নিচে একই বৃষ্টিতে আমরা ভিজব। সেই কথা রাখতে আমার ইচ্ছা করছে না।

হাত বাড়িয়ে দেখি, হাতঘড়িটায় বাজে এগারোটা। ছয় শ টাকার কাঠের চকিতে শুয়ে আছি। মাথার ওপরে একটা মশারি, নোংরা। এটা সব সময় টাঙানোই থাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ মনে হয় কাবেরির কথা। হঠাৎ করে মনে হয়, কাবেরির কাছে আমার একটা ঋণ হয়ে গেল। ওকে কথা দিয়েছিলাম, কালকে আমরা একই বৃষ্টিতে ভিজব। সেই কথা তো রাখা হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মেসটাতে আমি আর আবদুর রশিদ থাকি। আবদুর রশিদ চাকরি করেন, একটা বেসরকারি অফিসের হিসাবরক্ষক। এতক্ষণে তিনি অফিসের হিসাবকিতাব বার দুয়েক করে ফেলেছেন।

আমাদের রান্না করে দেয় হায়দার হোসেন। তার বয়স ১৬-১৭ বছর। হায়দার হোসেন আমার দরজায় এসে দাঁড়ায়, ভাইজান, বাজারের টাকা নাই। টাকা দেন।

আমি বলি, আমার কাছ থেকে বাজারের টাকা চাস কেন? রশিদ ভাইয়ের কাছে চাইতে পারিস না?

হায়দার বলে, ওই ভাইজান কইয়া গেছে, আপনে দিলে দিবেন। নাইলে খাওয়া বন্ধ।

আমি বলি, এই, আমি তোর রান্না কয় দিন খাইছি? আমারে খাওয়া বন্ধের হুমকি দিয়া লাভ আছে?

হাতিরপুল ভূতের গলির ভেতরে একটা অন্ধকার বাড়ির নিচতলায় স্যাঁতসেঁতে দুটো রুম নিয়ে আমাদের মেস। একটা রান্নাঘরও আছে। এগারোটা যে বাজে, সেটা ঘড়ি না দেখে বোঝার উপায় নাই। দিনের বেলা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

আপনে না খাইলে না খাইবেন। কিন্তু চুলা না জ্বললে যে আমারও খাওয়া বন্ধ। এইটা বুঝেন? হায়দার হোসেনের এই কথায় যুক্তি আছে।

তুই না খাইয়া থাকবি কেন? তোর মতো করে তুই রান্ধ। আধা কৌটা চাল রান্ধবি। আর দুইটা আলু। ব্যস। আর কিছু না।

আধা কৌটা চাউলও নাই। আপনে টাকা দেন।

আমি মনে মনে বলি, গাঞ্জা খাওনের ট্যাকা নাই, আর হে ভাত খাওনের লাইগা ট্যাকা চায়, লাটসাহেব আইয়া পড়ছে। মুখে বলি, টাকাপয়সা হাতের ময়লা হায়দার, ও তো আমি হাত ধোয়ার সাথে সাথে পানির সঙ্গে ড্রেনে চলে গেছে। তুই এক কাজ কর। রশিদ ভাইকেই ভালো করে ধর। নিশ্চয়ই উনি টাকা দেবেন।

আমার কাবেরির জন্য বেড়া উঠছে। খুব কাবেরিকে দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি ধরাম করে বিছানা ছাড়ি। পর্দা সরিয়ে দেখি, পাশের লাগোয়া বিল্ডিং আর আমাদের ঘরের জানালার মধ্যকার এক হাত ফাঁকেই বৃষ্টির জল ঝরছে।

বৃষ্টি পড়ছে।

আমার কাবেরির কথা মনে পড়ছে।

বাথরুমে যাই। দাঁত মাজব কি না ভাবি। রোজ সকালে উঠেই যে দাঁত মাজতে হবে, এই নিয়ম আমি মানি না। কোনো নিয়মই আসলে মানতে ইচ্ছা করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজকে আমার মনে পড়ে যে আমি যাব কাবেরির সঙ্গে দেখা করতে, ওর সামনে বাসিমুখে যাওয়াটা উচিত হবে না। কাবেরি হলো সৌন্দর্য আর শুচিতার মূর্ত প্রতীক। আমাকে অবশ্যই তার সামনে যথাসম্ভব পরিষ্কার দেহ আর সাদা মন নিয়ে হাজির হতে হবে।

আমি দাঁত মাজি। নিজের টুথপেস্টের কোনো বালাই নাই, রশিদ সাহেবের টুথপেস্টের টিউবে হাত লাগাই, এটাতে টুথপেস্ট খুব কমই আছে, কিংবা একেবারেই নাই, কিন্তু নানা কসরত করে, শরীরের সমস্ত শক্তি দুই বুড়ো আঙুলে কেন্দ্রীভূত করে খানিকটা পেস্ট বের করতে সমর্থ হই।

বাইরের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই একটা জিনস যে কত দিন ধরে পরছি, তার হিসাব আমি নিজেও জানি না। আজকে আমার মনে হয়, গোসল করা উচিত, কাপড় পাল্টানো উচিত। আমি কলের নিচে বালতি বসাই, ট্যাপ খুলি, জল ঢালি। বালতি পুরোটা ভর্তি হওয়ার আগেই পানি ফুরিয়ে যায়।

বাসাওয়ালার সামনে যাওয়ার মুরোদ আমার নাই, ইচ্ছাও নাই। কত দিনের ভাড়া বাকি, ঠিক জানাও নাই। রশিদ ভাই জানেন।

রশিদ ভাই যে আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়ে নতুন কোনো ভাড়াটিয়াকে সঙ্গী করে নেন না, এর পেছনের কারণ আমার জানা নাই। হয়তো তিনি আমাকে ভালোবাসেন। যারা মাতাল হয়, তাদের কোনো জ্ঞান থাকে না, আর যাদের জ্ঞান থাকে না, তাদের কোনো অন্যায়কেই অন্যায় বলে মনে করা উচিত নয়।

তবে একদিন আমি তার একটা উপকার করেছিলাম বটে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। আমরা দুজনে, আমি আর রশিদ ভাই, রিকশায় করে ফিরছিলাম। নীলক্ষেত থেকে যাচ্ছিলাম পলাশীর দিকে। ওই রাস্তাটা নির্জন। রাস্তায় খুব বাতিও ছিল না। হঠাৎ দুটো উস্কখুস্ক চুল তরুণ আমাদের সামনে মোটরসাইকেল থামায়। রিকশা থেমে যায়। ওরা দুজন নামে, ওদের হাতে রিভলবার বা পিস্তল বা এই জাতীয় কোনো অস্ত্র।

ওরা রশিদ ভাইয়ের কপালে পিস্তল ঠেকায়। বলে, কী খবর আলাউদ্দিন।

রশিদ ভাই কোনো কথা বলতে পারেন না।

আমি বলি, ওনার নাম আলাউদ্দিন নয়।

ওরা বলে, তাইলে তুই হারামজাদা আলাউদ্দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, ওনার নাম আলাউদ্দিন নয়, এটা উনি প্রমাণ করতে পারবেন। উনি অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ওনার আইডি কার্ড আছে। রশিদ ভাই, আইডি কার্ড দেখান।

রশিদ ভাই কোনো কথা বলতে পারছেন না। তিনি থরথর করে কাঁপছেন।

আমি তার প্যান্টের পকেটে হাত চালাই। মানিব্যাগ বের করি। দুইশ টাকা আর আইডি কার্ড। আইডি কার্ড ওদের সামনে ধরি। আমার হাতে লাইটার আছে। সেটা জ্বালাই। সেই আলোয় ওরা দেখে, রশিদ ভাইয়ের নাম আবদুর রশিদ।

তখন ওরা বলে, তাইলে তুই শালা আলাউদ্দিন।

আমি বলি, আমার নাম আক্কাস মাহমুদ। তবে সবাই আমাকে আকাশ বলে চেনে। গাঞ্জু আকাশ নামে আমি এই এলাকায় বিখ্যাত।

ওরা হেসে ফেলে। বলে, আপনি গাঞ্জু আকাশ। আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আমি হাসি। বলি, আশা করি, ভালো কথা শুনেছেন।

এই সময় আরেকটা রিকশা পেছন দিক থেকে আমাদের অতিক্রম করে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে সেটার গতিরোধ করে।

আমাদের রিকশা সামনে চলতে থাকে। ওস্তা নির্দেশ দেয়, সোজা চইলা যান। পিছনে তাকাইবেন না।

এই সময় পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনি।

আমরা পেছনে তাকাই না।

পরে জানতে পারি, ওইখানে আলাউদ্দিন নামে একজনের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে।

কাগজে সেই লাশের ছবি ছাপা হয়। সেটা হাতে নিয়ে রশিদ ভাই কাঁদতে থাকেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বলতে থাকেন, আমি তো মারাই গেছি। এই যে আমার লাশ। কালকা আপনি না থাকলে আমি বাঁচতাম না। আমার মাথায়ও আসে নাই আমার পকেটে আইডি কার্ড আছে। আপনে আমারে নয়া জীবন দান করছেন। আপনার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না।

আমি বলি, হেই মিয়া, কান্দেন কেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষ কান্নাকাটি করলে খুব খারাপ দেখায়। চুপ থাকেন মিয়া।

এর পর থেকে আমার যাবতীয় অত্যাচার রশিদ ভাই সহ্য করে চলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভাড়ার টাকা দিই না, খাওয়ার টাকা দিই না, কোনো মাসে আবার কোথাও থেকে টাকা এসে গেলে একসঙ্গে অনেক টাকা দিয়ে দিই রাজাধিরাজের মতো, দুই দিন পরেই আবার রশিদ ভাইয়ের কাছেই হাত পাতি।

রশিদ ভাই কি জানবেন, তাঁকে যে সেদিন রিভলবারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সে আকাশ না, আক্কাস মাহমুদও না, সে হলো ওই কয় টাকার গঞ্জিকা। মাল টানা থাকায় কী একটা সাহস এসে ভর করেছিল আমার ওপর। রিভলবার-বন্দুক কোনো কিছুকেই কোনো ভয়ংকর মাল বলেই মনে হয়নি। আরে মাল টানা থাকলে কোনো মালকেই মাল বলে মনে হয় না, শালা।

এখন যতটুকু পানি বালতিতে ধরা গেছে, ততটুকুন দিয়েই আমি গোসল সারি। একটা প্যান্ট পাই, যেটা পরিষ্কার, যদিও ইস্তিরি করা নয়, সেটাই পরি। ওপরে পরার মতো হাতের কাছে কিছু পাই না, রশিদ ভাইয়ের ঘরে ঢুকে তাঁর একটা পাঞ্জাবি গায়ে চাপাই। তাঁর আফটার শেভ লোশন খানিকটা পাঞ্জাবিতে মাখি।

আমাকে কাবেরির কাছে যেতে হবে। এই পথচলা মানে আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া।

আমি হায়দারকে ডাকি। ওর হাতে একটা এক শ টাকার নোট দিয়ে দিই। আজ আমি বাদশা আকবর, আজ আর হরিপদ কেরানি নই। আমি যাচ্ছি আমার কাবেরির সঙ্গে দেখা করতে। এই হাত ছুঁয়েছে কাবেরির হাত, এই হাতে আমি কি আর কোনো পাপ করতে পারি?

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কি আমি কাবেরির কাছে যাব? নাকি একটা রিকশা নেব? আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। কিছু টাকা এখনো আছে, যেটা আবার 'মাল' কেনার জন্য দরকার হবে। নেশা না করে তো আমি থাকতে পারব না। আর কাবেরির জন্য সবচেয়ে ভালো উপহার হবে ওকে মাল কিনে দেওয়া। সে জন্যও তো টাকা লাগবে।

আবার কাবেরির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার কাকভেজা হওয়া ঠিক হবে না। একটা রিকশাই নিতে হবে। আমি বাসা থেকে বের হই। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে মাথা বাঁচিয়ে চলি। পথে জমা পানি অবশ্য প্যান্টের নিচটা ভিজিয়ে দেয়। পায়ে রাবারের স্যান্ডেল, সেগুলো ভিজলে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই। গলি পেরিয়ে রাস্তায় আসি, আর একটা মুদি দোকানের ঝাঁপির নিচে আশ্রয় নিই। রিকশার জন্য অপেক্ষা করি।

একটা রিকশা জুটে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুডতোলা রিকশা। পলিথিন পর্দার মতো করে ঝোলানো। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নাই ভেতরে যাত্রী আছে কি নাই। আন্দাজে ঢিল ছুড়ি, ওই খালি, যাইবা?

রিকশা দাঁড়ায়।

আমিও ঝটপট উঠে পড়ি।

চলেছি কাঁটাবন বস্তির দিকে। হাতিরপুলের মোড় পার হয়েছি কি হইনি, একটা মিহি সুরের ডাক, ওই যাইবা, কাঁটাবনের ঢাল।

যাচ্ছি তো ওখানেই। যিনি যেতে চাইছেন, তাকে তুলে নিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। আমি মাথা বার করে তাকাই।

এর নামই প্রকৃতির ষড়যন্ত্র।

আর কেউ নয়। কাবেরি দাঁড়িয়ে। আনন্দ ফার্নিশার্সের সামনে।

আমার কলজে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে ওঠে।

বলি, এই রিকশা, দাঁড়ান দাঁড়ান।

তারপর রিকশা থেকে নেমে বলি, কাবেরি না? ওঠো। উঠে পড়ো।

কাবেরি বলে, তুমি কোত্থেকে। জ্বালায়া মারলা তো। যেইখানে যাই, সেইখানেই এই ছ্যামড়া।

মনে হয় বলি, আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই দেখি তায় সকলখানে। বলি না। কাবেরি স্মার্ট মেয়ে। কাঁটাবন বস্তিতে বকুলের মার মজমায় বসে গাঁজা টানে। এইসব ঊনবিংশ শতকি কথায় সে পটবে না।

তাকে বলি, কাঁটাবনেই যাচ্ছি। উঠলে ওঠো।

সে বলে, আমি কেন তোমার রিকশায় উঠব?

আমি বলি, রিকশা আমি কিনি নাই। রিকশা কেনার মতো সামর্থ্য আমার নাই।

সে বলে, আরে আমি বলতেছি নাকি তুমি কিনছ। আমি বলতেছি, তোমার ভাড়া করা।

আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি ওঠো। তুমি যাও। আমি যাব না।

না। সেইটা কেমনে হয়।

হবে। ওঠো।

ওয়েল। আমার নিডটা আর্জেন্ট। আমাকে উঠতেই হবে।

আমার নিডটা আর্জেন্ট না। তুমি যাও। আমি আরেকটা রিকশা নিয়া আসতেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশা পাওয়া যায় না। আমি এক ঘন্টা ধইরা এইহানে খাড়ায়া আছি।

আচ্ছা, না পাওয়া গেলে আমি হাঁইটা যাব। এইখানেই তো।

'আচ্ছা' বলে সে রিকশা নিয়ে চলে যায়।

আমি তার রিকশার চলে যাওয়া দেখি।

এখান থেকে কাঁটাবন মোটেও দূরে নয়। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রশিদ ভাইয়ের পাঞ্জাবিটা ভিজে শেষ হয়ে যাবে। হোক। তবু আমাকে যেতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার পা দুটো চলতে শুরু করে। বৃষ্টিতে ভিজে যাই। পুরোপুরি ভিজে গেলে একেবারে দ্বিধাহীন চিত্তে চলতে থাকি। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।

গান গাইতে থাকি:

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

তাই হেরি তায় সকলখানে।

হাঁ করে গাইতে গেলে মুখে বৃষ্টির পানি ঢোকে। আমি সেই পানি পান করি। ভিজে জবজবে হয়ে কাঁটাবন বস্তির গলি-উপগলি পেরিয়ে আমাদের আস্তানায় পৌঁছাই। বকুলের মার ঘর।

ভরদুপুরে সেখানে আসর বসে গেছে।

আসরের প্রধান আকর্ষণ কাবেরি। সে কণ্ঠেতে এমন টান মারছে...

আমি যেতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আহা, কী ভেজাটাই না তুমি ভিজেছ ইয়ার। কাম অন। টান দাও।

বকুলের মা আসে। একটা লুঙ্গি দিয়ে বলে, এইটা পইরা লন। ভেজা কাপড়গুলান খুলেন। আরাম কইরা টান দেন।

রাশেদ বলে, দোস্তো। মালটারে পটায়ে ফেল। এইটারে ঠিকমতোন ভাও করতে পারলে আর মালের লাইগা মালের অভাব হইত না।

আমি বলি, আমি কী পটাব। নিজেই পইটা গেছি।

রাশেদ বলে, মালটারে দিয়া আমরা পাখি ধরতে পারব। পার নাইট কমসে কম দশ হাজার টাকা সে আনতে পারব।

আমি বলি, ধেৎ, তুই যে কী বলিস না?

আমার কেন যেন কান্না পায়। রাশেদের সঙ্গে আর্ট কলেজের উল্টা দিকে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে দেবদারুগাছের সবুজ পাতা নিরীক্ষণ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

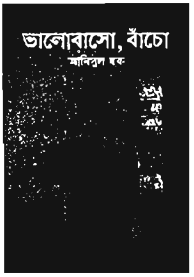

ছয়

কাবেরিকে বলি, কাবেরি রে। তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। সিরিয়াস কথা।

কাবেরি বলে, কী সিরিয়াস কথা?

আজ আকাশভরা আলো। পাবলিক লাইব্রেরির সিঁড়িতে বিকেলের হলদে রোদের বাঁকা রশ্মি। আমি কাবেরির হাতের আঙুল নাড়তে থাকি।

বলি, আই এম ইন লাভ উইথ ইউ, কাবেরি।

কাবেরি বলে, একটা ছেলে একটা মেয়েকে এইভাবে প্রপোজ করে? এইটা কোনো স্টাইল হইল?

আমি বলি, মানে আমি কোনো দিনও ভাবিনি এই জীবনে এই সব ন্যাকা কথা কাউকে বলব। কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। আই এম নট ইন মি।

ইফ ইউ আর নট ইন ইউ, তাহলে তো তোমার কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য না। তুমি আগে নিজেতে ফেরো।

না না, আমি আর নিজেতে ফিরতে চাই না। আমি তোমাতেই হারায়া যাইতে চাই।

তাইলে সুন্দর করে প্রপোজ করো। এর আগে আমি আটটা প্রপোজাল পাইছি। একটার চেয়ে আরেকটা প্রপোজাল সুন্দর হইছিল।

আমি একটু দমে যাই। এর আগে এই মেয়ে আটটা প্রপোজাল পেয়েছিল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে উদাস হয়ে তাকায় আকাশের দিকে। বিকেলবেলার আকাশে রঙিন মেঘের খেলা। নীল আকাশে লাল রঙের তুলির টান। সামনের বিদ্যুতের তারে এক ঝাঁক কাক।

আমার হাতে নিজের হাতের আঙুলগুলো অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে সে বলে, আমাকে একজন প্রপোজ করেছিল পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে বড় হেডলাইন করে। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বিছানার পাশে একটা পত্রিকা রাখা। সেই পত্রিকা খুলে দেখি, লেখা, আজ কাবেরির জন্মদিন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হচ্ছে।

আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। তার নিচের প্যারাতে লেখা: এই শুভ দিনে কাবেরিকে বিশেষভাবে উইশ করছেন তার একান্ত আপনার জন রায়হান কাদির।

আমি বলি, রায়হান কাদিরটা আবার কে?

আর বইল না। আমাদের পাড়ার ছাপাখানার মালিক। খুবই স্মার্ট একটা লোক। প্রেসের ভেতরেও সানগ্লাস পইরা থাকত। আমি তার ওখানে গেছলাম আমাদের স্কুলের সায়েন্স ফেয়ারের স্যুভেনির ছাপানোর কাজে। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক প্রেমে পইড়া যান। আমার জন্মদিন কবে কেমনে জানল আল্লাহ জানেন। আর পত্রিকাটা কী কইরা ঠিক আমার ঘরের বেড সাইড টেবিলে এক কাপ বেড-টির সাথে রাখা থাকল, তাই বা কে জানে?

তো এই প্রপোজালে তুমি সারপ্রাইজড হইয়া গেলা। ছাপাখানার মালিকের সাথে ঝুইলা পড়লা?

আরে এর চাইতেও এক্সাইটিং প্রপোজাল পাইছি না! নিজ হাতে কফি বানায়া আনছে। কফির কাপ পিরিচ দিয়া ঢাকা। খুলতেই দেখি ভেতরে লেখা আই লাভ কাবেরি। শালা, সাদা দুধে চকলেট কালারের লেখা কী সুন্দর ভাসতেছে। বুঝো। আমি তো অবাক। তার ফ্ল্যাটটা কী সুন্দর কইরা সাজানো। গানের যন্ত্র। হোম থিয়েটার। তার স্পিকারগুলান একেকটা একেক ঘরে। আর কফি বানানোর যন্ত্রটা বৈঠকখানার সাথেই। স্টুডিও ফ্ল্যাট টাইপ। আমারে বলল, বসো, কফি বানায়া আনি। সেই কফি দেইখা খাব কী পুরা টাস্কি। ওদিকে হোম থিয়েটারে গান বাজতেছে, ভালোবাসি ভালোবাসি সেই সুরে কাছে দূরে জলস্থলে বাজায় বাঁশি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অসহ্য লাগে। কোন লোকের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কাবেরি? লোকটা নিশ্চয়ই ব্যাচেলর ছিল। তার ফ্ল্যাটে গিয়ে কফি খাওয়ার পরে তারা কী করেছিল?

যা করে করুক। সেটা নিয়ে ভাবার অবকাশ আমার নাই। আমি স্থির নিশ্চিত যে আমি এই মেয়েটার প্রেমে পড়েছি। আমার ফেরার আর কোনো উপায় নাই।

আরেকজন আমাকে প্রপোজ করেছে কীভাবে জানো। পুরা একটা কবিতার বই সে লিখেছে আমাকে নিয়ে। বইয়ের পাতায় পাতায় আমার ফটোর জলছাপ। এই বইটা এনে সে আমাকে দেয়, বলে, পড়ে দেখেন। কেমন লাগল জানাবেন। আমি তো বই খুইলা পুরাই হেড স্টান্ড। আমার চেহারা একেবারে জলছাপ হইয়া গেছে। বললাম, আমার চেহারাটা এক শ টাকার নোটে বাঘের জলছাপের বদলে ছাপানো যায়?

আমি বলি, তোমার এইসব প্রপোজালের ডিসক্রিপশন থামাও। এরপর বলবা, তোমরা দুইজন স্কুবা ডাইভিং করতে নামছ সমুদ্রে। একটা হাঙর এসে বলল, হ্যালো ম্যাডাম, ইউ নো, হি লাভস ইউ।

কাবেরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হ্যাঁ। এই কেসও হইছিল। একটা ময়না পাখি আমাকে একজন গিফট করল। সে খালি বলে, কাবেরি যোগ সজল। কাবেরি যোগ সজল। বোঝো।

সজল হারামজাদাটা কে?

হারামজাদা বইল না। খুব সুইট একটা ছেলে।

হারামজাদা না? নবাবজাদা। সুইট কি না কীভাবে বুঝলা? চাইখা দেখছিলা।

মাইন্ড ইয়োর ল্যাংগুয়েজ, আকাশ। আকাশ, তোমার নামটা সুন্দর। আকাশের মধ্যে একটা ইনোসেন্স আছে। আর আছে বিশালতা। ইউ মাস্ট নট বি মিন।

আমি বলি, সবাই তো তোমাকে খুব সারপ্রাইজ দিছে। একেকজন একেক কায়দায় প্রপোজ করছে। আমি বরং স্ট্রেটকাট বলে দিই, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আই লাভ ইউ।

সে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে, আই লাভ ইউ টু। যাই রে। আজকে সবকিছু খুব বোরিং লাগতেছে।

কী বলো? আমি তোমারে প্রেমের প্রপোজাল দিলাম। আর তুমি বলতেছ বোরিং। এইটার মানে কী!

আচ্ছা, চলো। এইটা আমরা একটু এক্সাইটিংলি সেলিব্রেট করি। আজকে ফেনসি জোগাড় করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকই তো। আমাদের এই বিশেষ দিনটা উদ্‌যাপন করা উচিত বিশেষ কিছু দিয়ে। ফেনসিডিল কেনার মতো টাকা আমার কাছে নাই। একটা কাজ করা যায়। রাশেদের কাছে যাওয়া যায়। রাশেদ কোনো না কোনোভাবে টাকা জোগাড় করতে পারবেই।

রাশেদের খোঁজে আজিজ সুপার মার্কেটে যাই। বিকেল দ্রুত বিদায় হচ্ছে। সন্ধ্যা সমাগত। এই সময় পেছনের সিঁড়িতে ওকে পাওয়া যাবেই। আমরা আজিজ সুপার মার্কেটের সামনের সিঁড়িতে বসা কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের ভিড় চিরে পেছনের দিকে হাঁটি। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠি। তেতলায়।

রাশেদকে পাই না।

মিনহাজ নামের আমাদের এক বন্ধুকে পাই। দোস্তো রাশেদরে দেখছ?

রাশেদ তো মনে হয় পিজির পেছনে গেল। আমগাছতলায়।

আমি আর কাবেরি সিঁড়ি বেয়ে নামি। পিজির পেছনে আমগাছতলায় যাই। রাশেদকে পাই।

রাশেদ এগিয়ে আসে। তাকে বলি, দোস্তো, মাল জোগাড় কর তো।

কী মাল?

ডাইল।

অত মাল তো নাই।

মাথায় মাল উঠছে। মাল লাগবই। মাল জোগাড় করতেই হইব।

এত আর্জেন্ট হইল কেন। ঘাস খা।

না, ঘাস না। আজকা আমাদের দুইজনার একটা বিশেষ দিন। ডাইল খাইয়া ফুরফুরা হইয়া আমি কাবেরিরে প্রপোজ করব।

রাশেদ বোধ হয় ব্যাপারটা বোঝে। বলে, আচ্ছা, তোরা ব। আমি আইতাছি। আমরা তিনজন একটা সরকারি অফিসের পেছনের বারান্দায় আসি। সন্ধ্যার পরে এ এলাকায় কেউ থাকে না শুধু দারোয়ান ছাড়া। দারোয়ানকে বিশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে আমরা পেছনের বারান্দার এক কোনায় এসে বসি।

রাশেদ তার কাঁধের ঝোলায় হাত দেয়। বারান্দার অন্ধকারে বসেই আমরা ফেনসিডিল পান করতে শুরু করি।

প্রত্যেকের জন্য দুটো করে বোতল বরাদ্দ। দেড়টা বোতল পেটে পড়লে আমি কাবেরির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে কায়দা করে বসি। তারপর বলি, কাবেরি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার হাতটা আমাকে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাবেরি আমার হাত চুম্বন করে। আমি তোমার ভালোবাসা গ্রহণ করলাম। আই লাভ ইউ টু।

মশা খুব জায়গাটায়। যত না কামড়াচ্ছে, তারও চেয়ে বেশি শব্দ করছে। এই মশার গুনগুনকে আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর সংগীত বলে মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

কাবেরি আদুরে গলায় বলে, আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে চলো।

আমি আর্ত বোধ করি। প্রমাদ গুনি। আমার বাসা তো ঘোরতর গলির ভেতরে। ভূতের গলি আমার রাস্তার নাম। কিন্তু তার ভেতরে এই রকম একটা অন্ধকার বাসা খুঁজে বের করার জন্য প্রতিভার দরকার। স্যাঁতসেঁতে ওই ঘরে চামচিকার চাষ হওয়া সম্ভব। তবে আমার ঘরের নিচে সত্যিকারের মাশরুম গজাচ্ছে। আমি একটা লেপ রেখেছিলাম খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে, চকিটার নিচে, মেঝেতে। কয়েক দিন পরে দেখি পুরো লেপ পচে লেপ্টে আছে মেঝেতে, আর সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো ছত্রাক পড়েছে। আমার চকিটা সস্তা। বিছানায় ছেঁড়া ময়লা মশারি সদাসর্বদা ঝুলন্তই থাকে। এই শোচনীয় ডেরায় আমি কী করে নেব কাবেরিকে? কাবেরির প্রাক্তন প্রস্তাবকারী তাকে নিয়েছে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে, কফির পেয়ালায় প্রকাশ করেছে ভালোবাসার কথা, আর আমি তাকে নিয়ে যাব আমার ঘুপচি দম বন্ধ করা ইঁদুরের গর্তে?

কিন্তু সে ছাড়বেই না। আমার বাসাতেই সে যাবে।

আমি তখন ঠিক করি, তাকে আমি আমার মায়ের বাসায় নিয়ে যাব। মা সকাল সকাল তার অফিসে চলে যান। বাসায় কেউ থাকে না। তালা ঝোলে। মা কোথায় চাবি রাখেন আমি জানি। আমার জন্যই মা ওই গোপন জায়গাটায় চাবিটা রাখেন। আমি যদি কোনো দিন ফিরি। আমি কোনো না কোনো দিন ফিরব, এই আশা তিনি কখনো ছাড়েন না। আমার খোঁজে এখানে-ওখানে যান। আমাকে পান না। চিঠি লিখে রাখেন।

সেই রকম একটা চিঠি থেকেই আমি জানি, কোথায় চাবি থাকে। মা লিখেছিলেন, বাবা আক্কাস, তোর যখন ইচ্ছা তুই বাসায় আসবি। তোর জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের জানালার ভেতরে, বাম দিকের দেয়ালে নিচের দিকে পেরেকে বাসার চাবি সব সময় ঝোলানো থাকে। বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু তুই একটু হাতড়ালেই চাবিটা পেয়ে যাবি।

কাবেরিকে নিয়ে আমি রিকশায় উঠি, এই রিকশা চলো, মোহাম্মদপুর, খিলজি রোড।

কাবেরির গায়ে ঘামের গন্ধ। বর্ষাকালের ভেজা আবহাওয়ায় খুব ঘাম হয়। জামাকাপড় শুকাতেও চায় না। কাবেরির গায়ে একটা বুনো গন্ধ আছে, সেটা নাকে আসা মাত্র আমার পঞ্চেন্দ্রিয় জেগে ওঠে। আমার কেমন যে লাগে!

কাবেরির পরনে জিনস, গায়ে সাদা রঙের একটা শার্ট, বুকের একটা বোতাম খোলা, সেখানে একটা তিল। ওর বাম গালেও একটা ছোট্ট তিল আছে। ওর খাড়া নাক, বসে যাওয়া চোখ, কিন্তু তীব্র, ছলছল, কালো। ওর চোখের নিচে কালি জমে গেছে, তাতেই চেহারার আকর্ষণটা বেড়েছে। হিলহিলে শরীর, সাপের মতো।

বেলা এগারোটার দিকে আমরা মায়ের বাসার কাছে গিয়ে রিকশা ছাড়ি।

দোতলা পুরোনো বাড়ির নিচতলার বাম দিকের আড়াইটা ঘর নিয়ে মায়ের বাসা। জানালা আছে সামনে একটা। সেটার কবাট লাগানো থাকে। কিন্তু একটা চাবি বা কাঠি–কোনো কিছু দিয়ে চাড়া দিলেই কবাটটা খুলে যাবে। আমি তা-ই করি। জানালার কবাট খুললে আমি বাম পাশে নিচের দিকে হাতড়াই। সত্যি লোহার পেরেকে মায়ের ঘরের চাবি ঝুলছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাবেরি সব দেখে।

ওর নাকে ঘাম।

আমি তালা খুলি। তারপর দরজা খুলে কাবেরির হাত ধরে তাকে ভেতরে নিই। ঘরটা অন্ধকার। একটা গুমোট গন্ধ। ভেতর থেকে দরজা আটকে দিই। তারপর কাবেরিকে আমার বুকের সঙ্গে জাপ্টে ধরে ওর নাকের ঘাম দুই ঠোঁটে শুষে নিতে থাকি।

কাবেরি আমার গলা পেঁচিয়ে ধরে আমার কোলে উঠে পড়ে। দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে আমার কোমর।

এই আধখানা ঘরে বেতের সোফা আছে দেড়খানা, পাশেই আমার ঘরটা, অন্ধকারে আমি নিশ্চিত পদক্ষেপে কাবেরিকে কোলে করেই আমার ঘরে যাই, সেখানে বিছানায় এক জোড়া চোখ জ্বলছে, পেঁয়াজের ঝাঁজালো গন্ধ! আমি হাতড়ে আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটার সুইচ খুঁজে পাই, বাতি জ্বালি, একটা বিড়াল বিছানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে আছে, আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে, আমি কাবেরিকে নামাতেই সেটা একটা টেনিস বলের মতো লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাবেরির জামার আরেকটা বোতাম খুলে ওর বুকের তিলটা শুষতে থাকি। কাবেরি আমার নোংরা ঘামে ভেজা শার্টের বোতাম খুলতে থাকে, আমি তাকে সাহায্য করি শার্টটা খুলতে, আর সে মিউমিউ করে ডেকে ওঠে বিড়ালের মতো, আমার পিঠে নখ দিয়ে সে আঁচড় কাটতে থাকে।

তখন বিড়ালটা আমার বইয়ের র‍্যাকের ওপরে উঠে বসে আবার মিউমিউ করে।

ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। ঘর অন্ধকার হয়। বিড়ালের চোখ জ্বলে। ফ্যান বন্ধ হয়ে যায়। বেশ একটা নীরবতাও নেমে আসে ঘরটাতে।

কানের কাছে কাবেরির শ্বাসের শব্দ শুনি।

আমরা দুজন শেষ বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ায় একটা বন্ধ ঘরের ভেতরে পিঁয়াজের ঝাঁঝে ভরা বাতাস ফুসফুসে নিই এবং তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে গুমোট বাতাসকে আরও ভারী করে তুলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

ঘুম ভেঙে যায় হায়দার হোসেনের ডাকে।

হায়দার হোসেন আমার মশারির ওপারে, ভাইজান, ভাইজান।

আমি বলি, এই, এত ভোরে আমার ঘুমে ডিস্টার্ব করবি না, ভাগ।

হায়দার হাসে, বলে, ভোর কই দেখলেন ভাইজান, বারোটা বাজে।

আমি চোখ রগড়ে বলি, বারোটা বাজুক, বারোটা বাজুক, তোর কী। আমি বালিশ মুখের ওপরে তুলে চেপে ধরি।

ভাইজান, আপনার কাছে মেহমান আইছে।

আমার কাছে মেহমান আইছে? কে?

চিনি না। একটা মাইয়া মানুষ।

মাইয়া মানুষ। আমি ধড়মড় করে উঠে বসি।

এই সময় কাবেরির গলা শুনতে পাওয়া যায়, এই এত বেলা করে কেউ ঘুমায়! ওঠো ওঠো।

সর্বনাশ। এই গোয়ালঘরে কিন্নরীর প্রবেশ। এখন কী করি?

আমাকে কিছুই করতে হয় না।

হায়দার হোসেন রুম ত্যাগ করা মাত্র কাবেরি মশারির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি জালে আটকা পড়া রুই মাছের মতো কাতরাতে থাকি আর ও আমাকে জালসমেতই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

নিজেকে সেই জাল থেকে ছাড়াতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়।

আমি আলো জ্বালি।

কাবেরি বলে, এইটা কি একটা বাসা, নাকি এইটা একটা নর্দমা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, এইটা একটা ইন্দুরের গর্ত। আমি একটা ইন্দুর। আর তুমি একটা বিলাই।

সে আমার পিঠের মধ্যে আবার আঁচড় কাটে, মিউমিউ বলে ডাকে।

সে বলে, তোমার মার বাসাটা তো সুন্দর। মার সাথে থাকো না কেন?

বলি, বাদ দেও।

বাদ দিব কেন?

বুঝোই তো, মালমুল টানতে হয়। বাসায় না থাকাই সুবিধা।

না বুঝি নাই। আচ্ছা বুঝলাম বাসায় না থাকা সুবিধা। কিন্তু এই রকম নোংরা কেউ থাকে।

কী কও না কও। আমি তো এই স্বাধীনতার জন্যই বাসা ছাড়ছি। বাদ দাও তো। আসো। আমাকে আদর করো।

তোমার বাসি মুখ। বাসিমুখে আদর করব।

তোমার ইচ্ছা।

আচ্ছা...

দোরঘণ্টি বাজে। তারও পর দরজায় নক। ঠকঠকঠক। হায়দারকে বাইরে পাঠিয়েছি কোল্ড ড্রিংস কেনার নাম করে। সে কি এসেছে? সে কি এত জোরে নক করতে পারে? আমি কাবেরির বুকের নিচ থেকে মাথা তুলি। আরও জোরে শব্দ হচ্ছে। দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি?

টি-শার্ট পরে নিয়ে বের হই।

দেখি বাসাওয়ালা। এই মাসে বাসাভাড়া সব শোধ করে দিয়েছি। এই অসময়ে তো তার আসার কথা নয়।

তিনি বলেন, বাসায় লেডিস গেস্ট কেন? লেডিস গেস্টরে বাইর করেন। এই বাসায় লেডিস গেস্ট অ্যালাউড না।

আমি বলি, আচ্ছা। গেস্টের সামনে অভদ্রতা কইরেন না। যান।

আগে লেডিস গেস্টরে বাইর কইরা দেন। তারপর...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

রাশেদের হাতে সিগারেটের ফয়েল পেপার। তার ওপরে রাখা ব্রাউন সুগার। নিচে একটা মোমবাতি ধরা হলো।

কাবেরির হাতে একটা দুই টাকার নতুন নোট। সেটাকে সে পেঁচিয়েছে গোল চোঙের আকারে।

আমার হাতে আরেকটা দুই টাকার নোট। আমিও ওটা দিয়ে মাইক আকারের চোঙ বানাচ্ছি।

রাশেদের বোনের বাসা এটা। আপা ভারত গেছেন। বাসার চাবি দিয়ে গেছেন রাশেদের কাছে। আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। এরই মধ্যে আপার দুটো গহনা বিক্রি করে দিয়েছি। টাকার অভাব নাই। এখন আমরা আর ঘাসে নাই, ডাইলে নাই, আমরা নেশার রাজায় উত্তীর্ণ হয়েছি। পাউডার ধরেছি। আমরা এখন... চেজিং দ্য ড্রাগন।

প্রথম দিন হেরোইন নিয়ে কিছুই বুঝিনি। কোনো ফিলিংসই হয়নি। দ্বিতীয় দিনে একটু একটু ভাব এসেছে। তিন নম্বর দিনেই কিক এসে গেছে। শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠেছে ইনহেল করার সঙ্গে সঙ্গে। উফ মজা! চরম পুলকও এর কাছে কিছু না। অরগাজমের দশগুণ আনন্দ। সেক্সের আনন্দ যদি হয় তিন সেকেন্ড, এটা থাকে তার দশ গুণ বেশি সময় ধরে। আর ফুরফুরে ভাবটা থাকে ৫-৬ ঘণ্টা। উফ। সত্যি এ নেশার রাজা।

প্রথম শটটা নেয় কাবেরি। দ্বিতীয়টা আমি। তিন নম্বরটা রাশেদ।

আমরা এখন আকাশে ভাসছি। আমাদের মনে কোনো দুঃখ নাই। শুধুই আনন্দ এখন। কোথাও কোনো হতাশা নাই। কোথাও কোনো পরাজয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

টাকার খুব সংকট চলছে। আমাদের তিনজনের কারও কোনো আয়ের উৎস নাই। চাকরি-বাকরি ব্যবসা কোনো কিছুই আমরা করি না। ধারকর্জ করা, নিজেদের বাড়িঘরের জিনিসপাতি বিক্রি করে দেওয়া–এই আমাদের নেশার টাকা উপার্জনের উপায়। এবার আমাদের আয়ের সব পথ বন্ধ। বন্ধুবান্ধব আমাদের দেখলে পালায়। আত্মীয়স্বজন পুলিশে ধরিয়ে দিতে চায়।

আমাদের সামনে আর কোনো উপায় নাই।

কিন্তু হেরোইনের নেশা ভয়ংকর নেশা।

হেরোইন না নিলে নাক দিয়ে পানি ঝরে, গা কাঁপতে থাকে, হাতে-পায়ে খিল ধরে। সারা শরীরে ব্যথা করে। তারপর শুরু হয় পেটে ব্যথা। সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়, হেঁচকি, হিক্কা, বমি...

আমরা তিনজন বসে আছি তেজগাঁও রেলস্টেশনের একটা বগিতে। পরিত্যক্ত বগি। আমাদের হাতে মাল নাই, মাল কেনার মাল নাই, আমাদের অবস্থা শোচনীয়। মনে হচ্ছে মরেই যাব। এই অবস্থায় আমরা কী করব?

রাশেদ বলে, একটা উপায় আছে। মগবাজারে একটা বাসা আমি চিনি। আন্টির সাথে খাতিরও আছে। আন্টি ঘণ্টা হিসাবে রুম ভাড়া দেন। এক ঘণ্টা ভাড়া ৫০০ টাকা। কাবেরি ওই বাসায় যাইতে পারে। ক্লায়েন্ট আন্টিই জোগাড় করে দেবে। পার ঘণ্টা তিন হাজার টাকা ইনকাম হবে। ক্লায়েন্ট দেবে ৫। কাবেরি পাবে ৩। বাকিটা আন্টির। ঝামেলা সব আন্টির। থানা-পুলিশ কোনো প্রবলেম হবে না।

কাবেরির নাকে পানি। ওর কোল্ড টার্কি।

ও বলে, আগে আমারে পাউডার আইনা দে। পাউডারের বদলে যা করতে বলবি আমি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও শরীর কাঁপছে। অন্য সময় হলে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা খুন করে ফেলতাম, হয় রাশেদকে, নয়তো কাবেরিকে, নয়তো নিজেকে। কিন্তু এখন নিজের মধ্যে উইথড্রাল সিনড্রোম। আমি কিছু বলতে পারছি না। আমার গার্লফ্রেন্ড নেশার টাকা আনার জন্য শরীর বিক্রি করতে চাইছে, এটা আমি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আমার পেটে ব্যথা শুরু হচ্ছে। সময় নাই।

আমরা তিনজনে রিকশায় উঠে ছুটতে থাকি মগবাজারের দিকে। রাশেদ বলেছে, আন্টিকে বললেই অ্যাডভান্স দিয়ে দেবেন তিনি।

অ্যাডভান্স পেলে মগবাজারের আসলামের বস্তিতে ছুটব আমরা। ওখানেই পাউডার পাওয়া যাবে। পাউডার নেওয়া হয়ে গেলে কাবেরি যাবে আন্টির ফ্ল্যাটে। ততক্ষণে ক্লায়েন্টও এসে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

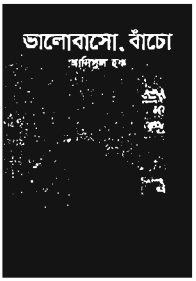

এগারো

হাজতের ঘরটা তেমন বড় নয়। মেঝে লাল সিমেন্টের। দেয়াল হয়তো সাদা ছিল, তবে এখন বহু লেখাজোখায় আকীর্ণ। নানা প্রকারের দাগও আছে, এমনকি মানুষের মাথার তেলের দাগ একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা বরাবর দেখা যাচ্ছে।

পাশেই টয়লেট আছে, পেশাবের তীব্র গন্ধ ভারী করে রেখেছে বাতাস।

আমার কোনো অনুশোচনা হচ্ছে না। আমি একটা খুন করেছি। এবং খুন করেছি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রাশেদকে। খুন না করে আমার কোনো উপায় ছিল না।

ও কাবেরিকে অসম্মান করে কথা বলেছে। এবং অসম্মান করেছে আমার মাকে।

সত্য বটে, কাবেরি আন্টির ফ্ল্যাটে নিয়মিত গেছে, কারণ তখন আমাদের টাকার প্রয়োজন ছিল, আর সে টাকা ও একা খরচ করেনি, আমাদের নিয়েই খরচ করেছে। ও দেহ বিক্রি করেছে এবং টাকা এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এবং তার পরও কাবেরি আমার প্রেমিকা। এই ব্যাপারটা রাশেদ বোঝে না, তা তো নয়। নেশার টাকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি করা আর প্রেমিকের বন্ধুর সঙ্গে শুয়ে পড়া এক কথা নয়। আমার বান্ধবীকে সম্মান করে চলা তার উচিত ছিল। সেটা সে করে নাই। কাজেই মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। তার ওপরে সে আমার মাকে অপমান করে কথা বলেছে।

সত্য বটে, মার ওপরে আমার অনেক রাগ। আমার এই জীবনটার ওপরেই আমার অনেক ক্ষোভ। আমার যে কিছু ভালো লাগে না, আমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম, পারলে জীবন থেকেই আমি পালিয়ে যেতে চাই, তার সবই মায়ের ওপর রাগ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিন যখন কাবেরি গেল মগবাজারের আন্টির ফ্ল্যাটে, ফিরে এল টাকা নিয়ে, তখন আমি আর্ট কলেজের পুকুরের ধারে বসে ছিলাম। তার আগেই আমাদের শট নেওয়া ছিল, কাজেই খুব ফুরফুরে ছিলাম। ওকে যতক্ষণ দেখিনি, ততক্ষণ কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। ও ফিরে এল খ্যাপ মেরে, আস্তে আস্তে আমার নেশা কেটে যেতে লাগল, আর আমি ফিরে আসতে লাগলাম বাস্তবে। কাবেরি আমার বাম পাশে বসে আছে। আমি ওকে বললাম, তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুম দেব। ও বলল, শরীরটা থিকথিক করতেছে। একটু শাওয়ার নিতে পারলে ভালো হতো।

আমি চুপ করে রইলাম। আকাশে অনেক চিল উড়ছে, কেন উড়ছে, কে জানে, আমি পুকুরের ধারে বাঁধানো চত্বরে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছি। আকাশটা আজ বড্ড নীল। কী ভীষণ শূন্যতা। আমার কান্না পেতে লাগল। আমি অনেক কষ্টে কান্না চেপে রাখলাম।

কাবেরি বলল, বাসায় যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এখন যেতে হবে। শাওয়ার নেব।

কাবেরি উঠে চলে গেল।

আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। শালা, নেশা আমাকে এই জায়গায় নিয়ে গেল। নিজের গার্লফ্রেন্ডকে পাঠালাম বেশ্যাবৃত্তি করতে। সেই টাকায় এখন আমরা নেশা করব। আমি কি শালা একটা মানুষ? আমি শালা একটা জানোয়ার।

হাজতে আরও পাঁচ-ছয়জন লোক। এর মধ্যে এখন একজনকে ঢোকানো হলো যার কাপড়চোপড় ছেঁড়া, ভুরুতে-ঠোঁটের কোণে রক্ত, হাত-পায়ে প্রহারের চিহ্ন। মনে হয়, গণধোলাই খেয়ে এসেছে। কে যে কীভাবে ধরা পড়ে এসেছে এখানে, বলা মুশকিল। একটা বাচ্চা ছেলে, আমার চেয়ে অন্তত তিন বছর ছোট হবে, কেন ধরা পড়েছে কে জানে, আম্মি আম্মি বলে কাঁদছে।

একজন বেঁটেখাটো কালো লোক, তার গলায় মাফলার, এই গরমের দিনে মাফলার কেন জানি না, আমার কাছে এসে একবার বলেছে, ক্যান ধরছে।

আমি বলি, খুন করছি।

লোকটা আমাকে আর না ঘাঁটিয়ে সরে বসে। মনে হয়, হাজতে খুনিদের বেশ সম্মান।

হাজতের লোহার গেট শব্দ করে খুলে যায়। দুজন চুল ছোট লোক আমার কাছে আসে। আমাকে নিয়ে যায় পাশের আরেকটা ফাঁকা রুমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে একটা চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়।

তারপর তারা দুজন ছোট্ট দুটো নোটবুক বের করে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে:

নাম কী?

আক্কাস মাহমুদ।

ডাকনাম কী?

আকাশ।

পিতার নাম?

আবার পিতা নাই।

পিতা নাই মানে? মারা গেছে?

আমি জানি না।

জানি না মানে, বাপ ছাড়া জন্মাইছস? বেজন্মা?

জি। ঠিক তাই।

মানে কী?

মানে আমার জন্মের ঠিক নাই। আমার মা কখনো বিয়ে করেন নাই। কিন্তু আমি তার পেটে চলে আসি। আমার যিনি জন্মদাতা, তিনি মাকে বিয়ে করেন নাই।

কী বলে? তারপর?

মা সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আমাকে জন্ম দেবেন। আমার জন্মদাতা মাকে নানাভাবে চাপ দেয় যেন বাচ্চাটা মা ফেলে দেন, অ্যাবরশন করান। মা বলেন, না, বাচ্চার কোনো দোষ নাই। আমি কেন তাকে মারব। তিনি আমাকে জন্ম দেন।

লোক দুইজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। একজন বলে, বেটা গাঁজা খাইছস নাকি?

আমি বলি, গাঁজা আমি জীবনে অনেক খাইছি। নানা ধরনের নেশাই করছি। হেরোইন পর্যন্ত ধরছিলাম। পরে রিহ্যাব পর্যন্ত করছি। হেরোইন ছাড়ছি। এখন ফেনসিডিলের উপরে আছি।

যারে খুন করছিস তার নাম কী?

রাশেদ। ভালো নাম ওয়াহিদুজ্জামান।

অরে খুন করছিস কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আমার মায়ের সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিল। আমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়াও বলছিল।

কী খারাপ কথা?

আমার মায়েরে খানকি বলছে। আমার গার্লফ্রেন্ডরে খানকি বলছে। তখন আমরা দুইজনই লোড হইয়া ছিলাম। আমার মাথা চড়া ছিল। মাইরা দিছি।

এখনো কি মাথা চড়া?

জি না। এখন ঠিক আছি।

লেখাপড়া কতদূর করছিস?

আমি স্কুল শেষ করছি। কলেজে ভর্তি হইছিলাম। শেষ করি নাই।

শেষ করিস নাই কেন?

ভাইরে, জাউরা পোলার আবার লেখাপড়া কী? আমি যে জাউরা পোলা, এইটা তো আর চাপা থাকে না। লোকে এইটা ওইটা কয়। বন্ধুবান্ধবরা তেমন কিছু কয় না। আত্মীয়স্বজন, সেইটা আমার মায়ের পক্ষের হোক, আর বাপের পক্ষের হোক, আমারে পাইলেই হইল, সিম্প্যাথি দেখাইতে আরম্ভ করে। কয়, তোমার বাপে তোমার খোঁজ লয়? সে তো সুখে-শান্তিতে আছে। আরও দুইটা বিয়া কইরা বরিশালে লঞ্চের ব্যবসা করতেছে। তোমার এত কষ্ট। বাপের কাছে যাও। গিয়া কও, আমার মারে আপনি বিয়া করেন, দুইটা বিয়া করছেন, তিন নম্বরটা করতে দোষ কী? বাঁইচা থাকো বাবা, তোমার তো কোনো দোষ নাই, তোমার গায়ে তো আর লেখা নাই তুমি জারজ, যদি দোষ কিছু থাকে তোমার মায়ের নাইলে তোমার বাপের।

রাশেদরে খুন করছিস কি একা? নাকি সাথে কেউ ছিল?

না, সাথে কেউ ছিল না। একলাই।

কী দিয়া?

একটা ছোট্ট ছুরি দিয়া। ছুরিটা তো জমা দিছি শমসের সাহেবের কাছে।

কেউ তোকে লাগাইছিল অরে খুন করতে?

জি না। আমি নিজে থাইকাই করছি।

শোন। আমরা সাংবাদিক ডাকতেছি। তোর ফটো তোলা হবে। আগামীকাল সব পেপারে পত্রিকায় তোর ছবি ছাপা হবে।

স্যার, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমার মায়ের কাহিনিটা যেন ছাপা না হয়। আমার মা গত কুড়িটা বছর আমারে নিয়া কষ্ট করছে। সমাজ তারে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঞ্জনা দিছে। বরিশাল থাইকা ঢাকায় আইসা অতি কষ্টে আমারে মানুষ করার চেষ্টা করছে। আমার ছবি ছাপায়া যদি এই কাহিনি পেপারে তুইলা দেন, তাইলে আমার মায়ের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকব না। আপনাগো আমি কইছি, আমি খুন করছি আমার মায়ের সম্মানের লাইগা। আবার যদি আমার মায়ের সম্মানের উপরে আঘাত আসে, তাইলে আমারে আবারও খুন করতে হইব। আমি স্যার নরমসরম মানুষ। জীবনে একটা তেলাপোকাও মারি নাই। আমারে খেপায়েন না। আর আমার মায়েরে আপনারা কষ্ট দিয়েন না। তারে একা একা বাকি জীবনটা সবার চোখের আড়ালে থাকতে দেন।

আমার কথা তারা শোনে, মন দিয়ে শোনে বলেই আমার মনে হয়, কিন্তু তারা আমার কথা মানবে কি না, আমি নিশ্চিত হতে পারি না। আমি হাতজোড় করি, এবার জোর দেবার জন্য ইংরেজিতে বলি, আই হাম্বলি অ্যান্ড আর্নেস্টলি রিকোয়েস্ট ইউ টু কিপ দ্য অনার অব মাই পুয়োর মাদার। প্লিজ...প্লিজ...দিস ইজ অ্যান আপিল ফ্রম আ পুয়োর চাইল্ড টু সেভ দ্য ডিগনিটি অব হিজ মাদার। অ্যান্ড দিস ইজ নট আ কোশ্চেন অব অনার অব এন ইনডিভিজুয়াল, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন অব ডিগনিটি অব মাতৃজাতি... মাতৃজাতির সম্মান আশা করি আপনারা রাখবেন। প্লিজ ডোন্ট ডিসক্লোজ হার আইডেনটিটি, ডোন্ট ডিসক্লোজ দ্য সিক্রেটস অ্যাবাউট মাই বার্থ...

প্রভুজাতির ভাষা ব্যবহারের ফলে কিছুটা কাজ হয় বলে মনে হয়। উপস্থিত জেরাকারীগণের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারা আমার কথাটা রাখবেন।

আমি বলি, অ্যান্ড হি ট্রায়েড টু রেপ মাই গার্লফ্রেন্ড। সে আমার বান্ধবীকে রেইপ করতে চাইছিল। সেইটাও আপনারা বলতে পারেন। নারীঘটিত কেলেঙ্কারি।

তোমার গার্লফ্রেন্ড? তার নাম কী?

তার নাম কাবেরি। কাবেরি চৌধুরী।

সে আবার কে?

সে কাবেরি চৌধুরী।

পিতার নাম কী?

ওয়েল। তার আবার দুইটা বাবা। আমার বাবার ঠিকানা নাই। আর তার দুইটা বাবা। দুইটারই ঠিকানা আছে।

মানে কী?

তার মা দুইটা বিয়া করছেন। কাবেরি আগের পক্ষের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি কই?

কলাবাগান।

ঠিকানা বলো।

কলাবাগান সরকারি কোয়াটারগুলানের উল্টা দিকে।

নম্বর কত?

জানি না।

টেলিফোন নম্বর?

ওদের বাসায় টেলিফোন আছে বটে। আমি নম্বর মুখস্থ রাখি নাই। আমার বাসার দেয়ালে লেখা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

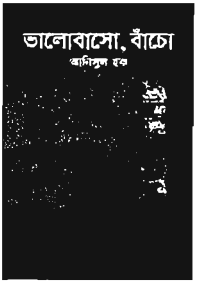

বারো

সন্ধ্যার পর আমার খোঁজ নিতে আসে কাবেরি। আমি তাকে দেখি গরাদের ওপারে, মাথার ওপরে জ্বলা ইলেকট্রিক বাতির আলোয় তাকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়।

সে বলে, কী হইছে বলো তো!

আমি নির্বিকারভাবে বলি, আমি রাশেদরে খুন করছি কাবেরি।

কাবেরি চুপ করে থাকে।

আমি বলি, আমি নিজে ধরা দিছি। খুন করেরা নিজেই থানায় আসছি।

এখন কী হবে?

কী হবে? ফাঁসি হতে পারে বড়জোর।

কাবেরির নাকে নাকফুলের জায়গায় একটা সুতো পেঁচানো। নীল শার্টে কাবেরিকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। তার নাকের ওপরে ঘাম, ঠোঁটের ওপরেও ঘাম। ওই ঘাম শুষে খাওয়ার জন্য একদা আমি খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

খুন করতে গেলা কেন?

ইচ্ছা হইল।

এইটা কোনো কথা। ইচ্ছা হইল আর তুমি খুন করলা?

হ্যাঁ। ইচ্ছা হইলেই খুন করতে হয়। ইচ্ছার একটা দাম আছে না?

ডিবির লোক দুইটা আসে। বলে, ইনি কি কাবেরি?

আমি বলি, হ্যাঁ।

ভেরি গুড। কাবেরি চৌধুরী, আপনাকে একটু পাশের ঘরে আসতে হবে। আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

কাবেরি বলে, আমাকে আবার কী জিজ্ঞাসা করবেন।

সেটা একবারে ওই ঘরেই করি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আপনাদের যা জিজ্ঞাসা করার অর সামনে করেন। আমি একজন মেয়ে, আপনাদের দুজনের সাথে আলাদা ঘরে যাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা আকাশকেও সাথে নিচ্ছি। ওকে?

ওকে।

আমি, কাবেরি আর দুইজন ডিবি কর্তা, আবারও সেই ঘরে। তারা প্রশ্ন করে। কাবেরি জবাব দেয়।

আপনার নাম কাবেরি চৌধুরী?

জি।

আপনার বাবার নাম?

আমার জন্মদাতা বাবার নাম আউয়াল চৌধুরী। আর আমি থাকি আমার মার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে।

তার নাম?

আলহাজ ওসমান গনি।

আপনার বর্তমান ঠিকানা

১১-বি, কলাবাগান, সেকেন্ড লেনের গলি

সেকেন্ড লেনের গলি?

হ্যাঁ। লেনের গলি। তাই বলা হয় এই বাসাকে।

আপনার মায়ের নাম?

রেশমা বেগম।

আপনার বয়স?

বিশ।

আপনি পড়াশোনা করেন?

ইডেন কলেজে ভর্তি হইছিলাম। কন্টিনিউ করি নাই।

কী ভর্তি হইছিলেন?

বাংলা অনার্স।

আপনার মা কবে আপনার প্রথম বাবাকে ছেড়ে আসেন?

আমার একটাই বাবা। আউয়াল চৌধুরী।

জি আপনার মা রেশমা বেগম কবে আপনার বাবা আউয়াল চৌধুরীকে ছেড়ে আসেন?

আমার যখন ১১ বছর বয়স।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন ওসমান গনির কাছে?

না। আমাকে ফেলে রেখে চলে আসছিলেন।

তারপর?

বেশ কিছুদিন মার কোনো খোঁজ ছিল না। আমি বাবার সাথেই ছিলাম। তারপর একদিন মা উদিত হইলেন। খবর পাঠাইলেন, আমার মেয়েকে ফিরায়া নিতে আসছি।

তখন আপনার বাবা কী বললেন?

বাবাও তখন ঠিক করছে আরেকটা বিয়ে করবেন। আমি তো তখন আপদ। আমি চলে গেলেই তিনি খুশি হন। আমাকে বিদায় দিয়ে দিলেন। আমি ওসমান গনির বাসায় আসলাম।

এই ঘরে আর কোনো ছেলেমেয়ে আছে?

হ্যাঁ। এই ঘরে দুইটা ছেলে আছে। একটার বয়স আট, একটার ছয়।

আকাশের সাথে আপনার কী সম্পর্ক?

আমার ফ্রেন্ড।

শুধু ফ্রেন্ড?

বয়ফ্রেন্ড।

রাশেদকে আপনি চেনেন?

চিনতাম।

সে খুন হয়েছে, আপনি জানেন।

আকাশের কাছে শুনলাম।

আকাশ কি রাশেদকে খুন করতে পারে?

জানি না। আমার মনে হয় না।

আকাশ বলতেছে সে রাশেদকে খুন করছে।

আমাকেও তাই বলতেছে।

কেন খুন করেছে আপনি কিছু জানেন?

না। আমি জানি না।

রাশেদ কি আপনাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল?

কাইন্ড অফ।

মানে কী?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ করছিল। করতে পারে নাই। নেশা করা ছিল। আমি অরে মাইর দিছি বরং উল্টা।

আপনার কি মনে হয়, সেই কারণে রাশেদকে আকাশ খুন করতে পারে।

হ্যাঁ পারে। তবে করছে কিনা আমি জানি না।

হ্যাঁ। রাশেদের লাশ পাওয়া গেছে। মগবাজার বস্তির আসলামের ডেরায়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আমি মুখ খুলি, বলি, আমি আসলেই খুন করছি কাবেরি। আর খুনটা করছি, কারণ, রাশেদ তোমাকে রেইপ করতে চাইছিল।

এই জন্য তুমি খুন করবা? কাবেরি খেপে যায়। এখন কী হবে? ও আমারে রেইপ করতে চাইছে, তুমি অরে খুন করতে চাইতা। ব্যস মিইটা যাইত। এখন? তুমি জেলে থাকবা, তোমার ফাঁসি হইব, আর আমি কী করব? কী যে পাগলামি করো তোমরা!

এখন আর বলে লাভ কী? আমি বলি, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

মিস কাবেরি... ডিবির বেঁটে ভদ্রলোক বলেন।

মিস মিস করবেন না তো। অসহ্য লাগে। কাবেরি বলেন।

আচ্ছা কাবেরি চৌধুরী। আপনার ফোন নম্বরটা দেন।

কাবেরি ফোন নম্বর দেয়।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আসে। তারা আমাদের সাথে কথা বলতে চায়। আমি কাবেরিকে বলি, তুমি চলে যাও। না হলে তোমার ছবি বড় করে ছাপায়া দিবে।

দিলে দিবে–কাবেরি কাঁধ ঝাঁকায়।

কাবেরি চলে যাচ্ছে। আমিই তাকে বলি, অনেক রাত। দেখেশুনে যাও।

কাবেরি যেতে যেতে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। তাকে খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে।

সে ফিরে আসে। আমার হাতে দুইটা পাঁচশ টাকার নোট দেয়। বলে, রাখো, কাজে লাগবে।

আমি বলি, আর কী কাজে লাগবে। আমার আর কোনো কাজটাজ নাই।

আমাকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছে। আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রিজন ভ্যান থেকে ঢাকা শহর দেখছি। এই উচ্চতা থেকে কোনো দিনও রাস্তাঘাট দেখি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এই রকম ছোট ছিদ্র দিয়ে। আমার শরীর কাঁপছে। আমার দাঁড়ানোর শক্তি নাই। রাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হয় নাই। আমার এখন নেশা করতে ইচ্ছা করছে। গায়ে খিঁচুনিমতো হচ্ছে। এই অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। বসে পড়ি। ভ্যানে আরও কয়েকজন হাজতি আছে। আমাদের সবাইকে কোর্টে তোলা হবে সম্ভবত।

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পেটে ব্যথা হচ্ছে। এমন ব্যথা, মনে হচ্ছে মরে যাব। আমি আর পারছি না।

আমার পাশে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরের দুনিয়া দেখছে। এখনো আমাদের জেলখানায় নেয় নাই, এত তাড়াতাড়ি বাইরের মুক্ত দুনিয়ার জন্য এরা এত আকুল হলো কেন?

একজন আমার পাশে বসে।

ভাই উকিল ঠিক করছেননি?

না।

আপনেরে তো তাইলে রিমান্ডে নিব। উকিল ঠিক কইরা জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নাইলে পিটায়া মাইরা ফেলব।

মাইরা ফেললে আমি বাঁচি। আমি তো মরতেই চাই।

মাইরা ফেললে তো বাঁইচাই যাইবেন। মাইরা ফেলব না। মাইরা মাইরা হাতপা গুঁড়া গুঁড়া করব। কিন্তু মরতে দিব না।

আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার এখন ডাইল দরকার।

আপনের ঢাকায় কেউ নাই। আপনার লাইগা উকিল ধরতে পারব না?

না। আমার এই পৃথিবীতেও কেউ নাই। কিন্তু আমার উকিল লাগব না। আমার লাগব ডাইল।

কী?

ডাইল।

ধুরো মিয়া। আপনে মরেন।

মারেন।

কী?

মাইরালান। আমি তো মরতেই চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালত প্রাঙ্গণে আমাদের নামানো হলো। আমার হাতে হাতকড়া। হাতকড়ার সঙ্গে দড়ি বাঁধা। সেই অবস্থায় আমাকে দেখতে লোকে ভিড় করে।

আপনে আকাশ না? একজন পান-বিড়িওয়ালা কিশোর এক গাল হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

ওই যে ওই যে আকাশ। একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আরেকজন মোচওয়ালাকে কনুই ঠেলে বলে।

ব্যাপার কী?

একজন একটা পত্রিকা মেলে ধরে আমার সামনে। এই যে আপনের ছবি আর আপনের ডারলিংয়ের ছবি ছাপা হইছে কাগজে। আজকার পেপারে এই খবরটাই সবাই পড়তাছে।

বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা দাঁড়িয়ে আছি আদালতের বারান্দায়। গায়ে বৃষ্টির ছিটা লাগছে।

আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। খিঁচুনি বাড়ছে।

এই সময় আমার প্রিজন ভ্যান সহযাত্রী আমার হাতে একটা কোকাকোলার বোতল ধরিয়ে দেয়। বলে, খান মিয়া।

আমি বলি, আমি কোক খাই না।

তিনি বলে, কোক না। আপনার ডাবিল।

আমি কোকাকোলার পাইপ দিয়ে জীবনের প্রথম ফেনসিডিল খাই। আহ, আপনে ভাই আমারে বাঁচাইলেন। আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

'বাবা।'

বসে ঝিমুচ্ছিলাম। এই সময় মার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাই। সত্যি মা।

আমি রাগী চোখে তাকাই। তুমি আসছ কেন? যাও।

বাবা তোর কী হইছে?

আমি তো তোমার সাথে কথা বলব না। তুমি যাও।

আমার সাথে তোকে কথা বলতে হবে না। তোর উকিল আছে?

আছে। তুমি যাও।

তুই তো খুন করিস নাই। আমার ছেলে খুন করতে পারে না।

আচ্ছা করি নাই। তুমি যাবা?

কাগজে মিথ্যা কথা লিখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। মাকে দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। আমার সমুদয় কষ্টের জন্য এই মহিলা দায়ী। এই মহিলা কি তা জানে না?

রোদ উঠেছে। বর্ষার এই দিনটা এমনিতেই ভীষণ তপ্ত। তার ওপরে উঠল রোদ। রোদ এসে আমার চোখেমুখে পড়ে। মা আমাকে আড়াল করে দাঁড়ান। তিনি আমাকে ছায়া দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমার মেজাজ আরও বিগড়ে যায়। আমি তাকে বলি, তুমি এখান থেকে যাবা? নাকি আমি এখানেই আত্মহত্যা করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

ওয়ারিতে আমাদের বাসা ছিল ডাকঘরের উল্টাদিকের রাস্তায়। বাসার সামনে একটা বই বাঁধাইয়ের দোকান, আরেকটা দর্জির কারখানা। পেছনে একটা দোতলা বাড়ির নিচতলায় একটা বেডরুম আরেকটা রান্নাঘর নিয়ে ছিল আমাদের বাসা। ওই বাসাটার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। বই বাঁধাইয়ের দোকানে একজন কর্মচারী ছিলেন, তাঁর ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি-গোঁফ।

মা সকালবেলা আমাকে নিয়ে বের হতেন স্কুলে। মার ছিল মেয়েদের স্কুল। সেই স্কুলেই আমি পড়তাম। আমার বয়স যখন দুই, তখন থেকেই আমি ওই স্কুলে পড়ি। এইসব কথা আমার তেমন মনে নাই, দুই বছর বয়সের স্মৃতি মানুষের থাকে না, কিন্তু মার কাছে শুনে শুনে সেইসব দিনও যেন আমি দেখতে পাই।

আমি যখন মার সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরতাম, বই বাঁধাইয়ের কারখানার পাশ দিয়ে গলি, সেই গলিপথে আমরা হেঁটে যেতাম ভেতরে। বুড়ো কারিগর আমাকে ডাকতেন, বাবু, আসো, বই নিবা? আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতাম। তিনি আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন। ছবিওয়ালা এত বড় বই। বইটার নাম, বাণিজ্যেতে *যাব আমি।* প্রথম লাইনটা আমার আজও মনে আছে, বাণিজ্যেতে যাব আমি সিন্দাবাদের মতো। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি ছিল। মা আমাকে বইটা পড়ে শোনাতেন। শুনতে শুনতে পুরা বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি এরপর পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে একা একাই পড়তে পারতাম। আমি পড়া জানতাম না, কিন্তু এই বইটা আমি পড়ে শোনাতে পারতাম।

তারপর আমি মার স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হই। মেয়েদের সাথে পড়ি।

আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, তোমার নাম কী?

আমি বলতাম, আক্কাস মাহমুদ আকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার আব্বার নাম কী?

আমি বলতাম, আমার আব্বা নাই, মারা গেছেন।

আহা! সবাই মুখটাকে বেশ দুঃখী দুঃখী বানিয়ে ফেলত।

আমার আব্বা মারা গেছেন, এই জন্য আমার কোনো দুঃখ ছিল না। যে আব্বাকে দেখি নাই, সেই আব্বা থাকলে কেমন হতো, আমার কোনো ধারণাই নাই। ফলে আব্বার জন্য কোনো বিচ্ছেদব্যথা আমার ছিল না।

মাই ছিল আমার পৃথিবী।

আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না। আমাদের বাড়িতে কোনো মেহমান আসত না। শুধু আসিফ মামা আসতেন মাঝেমধ্যে। বরিশাল থেকে।

তিনি আসতেন বরিশালের মিষ্টি আর ইলিশ মাছ নিয়ে।

আমার জন্য একবার একটা শার্ট এনেছিলেন। সেই শার্টটা ছিল একেবারে বড়দের শার্টের মতো। কলার, মধ্যখানে কাটা, বোতাম, বুকপুকেট, একেবারে বড়দের শার্ট যেন। রংও ছিল হালকা নীল। সেই শার্টটা আমার ছিল খুবই পছন্দ। সেটাকে বলতাম নানির দেওয়া শার্ট। আসিফ মামা শার্টটা আমাকে পরিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, এই শার্ট তোমাকে তোমার নানি দিয়েছে।

আমি কোনো দিন নানাবাড়ি যাই নাই। দাদাবাড়ি যাই নাই। মা স্কুলে চাকরি করেন, আমি তার সঙ্গে থাকি, এইটাই ছিল আমাদের জীবন, আর এটাকেই আমি স্বাভাবিক বলেই জানতাম। আমার কোনো অভিযোগ ছিল না।

একজন গৃহপরিচারিকা ছিলেন আমাদের। তাকে ডাকতাম নাসিমা খালা। একবার মার খুব জ্বর হয়েছিল। মা আর বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। নাসিমা খালা কোত্থেকে একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। সেই ডাক্তারের ছিল বিশাল ভুঁড়ি। সেই ডাক্তার মাকে ইনজেকশন দিয়েছিল। আর বলেছিল, এই গুডবয় ছেলেটাকে ওর মার কাছ থেকে দূরে রাখবে।

আমি মার জ্বরের সেই কটা দিন নাসিমা খালার সঙ্গে ঘুমাতাম।

নাসিমা খালা মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমাতেন। আমিও তার পাশে ঘুমাতাম।

আমি শুধু মার কাছে যেতে চাইতাম। নাসিমা খালা বলতেন, মার জ্বর আগে ভালো হোক। নাইলে তুমারেও মার মতোন সুই দিব।

ক্লাস থ্রিতে উঠে আমি বিদ্রোহ করলাম। বললাম, মা, আমি মেয়েদের স্কুলে পড়ব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বিপদে পড়লেন বলে মনে হলো। আমাকে বোঝাতে লাগলেন, ছেলে আর মেয়ে আলাদা কিছু নয়। আমি বললাম, তা হোক, তবু আমি ছেলেদের স্কুলেই পড়ব।

আমাকে ওয়ারি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন মা।

সকালবেলা আমরা একসাথে স্কুলে যেতাম।

দুপুরবেলা আমাকে স্কুল থেকে আনতেন নাসিমা খালা।

নাসিমা খালা একদিন আমাদের বাসা থেকে চলে গেলেন।

তখন স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও আমি স্কুলেই থাকতাম। মাঠে খেলতাম। দুপুরবেলা মা তার স্কুল থেকে এসে আমাকে নিতেন। তারপর আমরা মা-ছেলে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম।

ক্লাস থ্রিতেই আমি প্রথম শুনি, আমি হলাম জাউরা পোলা।

আমাকে এটা বলে ক্লাস ফাইভের ছাত্র জসীম।

সে এসে বলে, এই আকাশ, এই দিকে আয়। তোর বাপের নাম কী?

আমি বলি, মাহমুদুল হাসান।

তোর বাপে কই?

হে মইরা গেছে।

মইরা গেছে। জাউরা পোলা কুনকার।

আশপাশের সব বাচ্চা হেসে ওঠে। জসীম বলে, হের বাপের ঠিক নাই। হের মায়ে একটা খানকি।

আমি কেঁদে ফেলি।

এর পর থেকে স্কুলে ছেলেরা আমাকে খেপাত জাউরা পোলা বলে।

আমি সহ্য করতে না পেরে একদিন মাকে বলে দিই। মা, এই স্কুলে আমি আর পড়ব না।

কেন বাবা?

মা, এই স্কুলটা পচা।

কী হয়েছে।

আমি বলি, ওরা আমাকে জাউরা পোলা, খানকির পুত বলে খেপায়।

মার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি মাকে জড়িয়ে ধরি। মার শরীরে একটা আশ্চর্য গন্ধ ছিল। আমি মার আঁচলের তলে ঢুকে পড়ি। আমার ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা আমাকে বলতেন, শোন, এই দুনিয়ায় আমার তো আর কেউ নাই। একমাত্র তুই আছিস। তুই যখন বড় হবি, মাকে কি তুই লাথিগুঁতা দিয়ে ফেলে দিবি?

আমি বলতাম, কখনো না মা। বড় হলে আমি একটা গাড়ি কিনব। আর সেই গাড়িতে করে আমি তোমাকে ঘোরাব।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন।

আমি ক্লাস সিক্সে উঠে হাইস্কুলে যাই আর তখনই আমি বুঝে ফেলি, আমার জন্মের একটা সমস্যা আছে।

বরিশালের লোক দেখলেই তখন আমি পালাতাম।

কিন্তু আমার কপাল ছিল খারাপ। কোত্থেকে কোত্থেকে বরিশালের লোকদের সাথেই আমার দেখা হয়ে যেত।

একবার আমি গেছি আমার ক্লাসমেট হাসানের বাসায়। ওর মা বললেন, তুমি সাবিহা ম্যাডামের ছেলে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তোমার মায়েরে ঠিকভাবে দেখাশুনা করবা, তারে কোনো দুঃখ দিবা না বুঝলা। বাপরে মহিলার সাহস। বিয়া হয় নাই, পেডে বাচ্চা আসছে, বরিশাল থাকিয়া ঢাকা চলিয়া আসছে, কিন্তু বাচ্চা ফেলে নাই। তোমার বাপটা তো একটা মাতাল। তোমার মাও তারেই বিয়া করার লাগিয়া কেন যে বাউলা হইল, বোঝতে পারলাম না।

আমি আস্তে করে হাসানদের বাসা থেকে কেটে পড়লাম। কিন্তু হাসান পুরা স্কুলে কথাটা চাউড় করে দিল।

আমার আর কিছু ভালো লাগে?

তবু এসএসসিটা আমি পাস করেছিলাম। ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হয়েছিলাম তিতুমীর কলেজে। শেষ করি নাই।

সিগারেট ক্লাস নাইনেই ধরেছি। গাঁজা ধরলাম ক্লাস টেনে। কলেজে গিয়ে একেবারেই বখে গেলাম। বাসা ছাড়লাম। মার সাথে আর থাকব না।

মার মুখও আমি দেখি না।

এই যে আমার জীবনটা ভরা কষ্ট, এই জীবনের জন্য একমাত্র দায়ী আমার মা। তিনি কেন আমাকে ফেলে দিলেন না? গর্ভপাত তো এই দেশে একটা বৈধ ব্যাপার। কতজনের পেটে বাচ্চা আসে। কতবার ফেলে দেয়। আমার মায়ের সেই বুদ্ধি হলো না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানা হাজত থেকে আমাকে আনা হলো জেলখানায়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। আসামী আমি। আমার এখনও শাস্তি হয়নি। আমার বয়সও কম। আর স্বাস্থ্য খারাপ। তাই কারাগারে আমা শ্রেণীগত অবস্থান বেশ নিচের দিকে। তবে যেহেতু আমি খুনের আসামী, কাজেই সেদিক থেকে আমার স্থান বেশ উঁচুতে। কী কেস? মার্ডার কেস। বলতেও বেশ গর্ব হয়।

জেলখানা একটা বেশ নোংরা ব্যাপার। ড্রেনে পানি আসে, সেখান থেকে মগে করে তুলে একসঙ্গে সার বেঁধে গোসল করতে হয়। পায়খানা বর্ণনাতীত। কিন্তু আমি যে জীবন যাপন করেছি, তাতে আমার কাছে এসব অসহ্য বলে মনে হয় না।

রোজ সন্ধ্যায় আমাকে সেলের মধ্যে ঢোকানো হয়। তার আগে হয় গোনা। মানে গণনা। আমরা লাইন ধরে বসি। আমাদেরকে গণনা করা হয়। তারপর ঢোকানো হয় ছোট্ট একটা খুপরির মধ্যে। একটা সানকিও আছে ভেতরে। পেশাব-পায়খানা ওই শানকিতে করতে হবে রাতের বেলা।

আমার তখন বেদের মেয়ে জোছনা ছবির গানটা মনে পড়ে। মুজিব পরদেশীর গাওয়া গান।

AMARBOI.COM

আমি বন্দি কারাগারে
আছি গো বিপদে
বাইরের আলো চোখে পড়ে না মা
জেলখানার সম্বল
থালাবাটি কম্বল
এ ছাড়া অন্য কিছু মেলে না
সকাল আর সন্ধ্যায় দুইটি রুটি দেয়
দুটি খেয়ে পেট ভরে না

শনিবার আর মঙ্গলবার
তোমার আমার দেখাবার
তাও তো দেখা তুমি করো না
আর জ্বালা সয় না
প্রাণে যে মানে না
মশার কামড়ে ঘুম ধরে না মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাসি পায়। আমি বন্দি কারাগারে মা বললে যে একটা বড় ক্যানভাস চোখে পড়ে, এই পৃথিবীটাই একটা বন্দিশালা, আমাদের জীবনটাই একটা খাঁচা, তা থেকে মুক্তি নাই, এই গানটা সেদিকে না গিয়ে একেবারে জেলখানার বাস্তব সমস্যা নিয়ে রচিত। আমাদের রুটি দেয় একবেলা, ভাত দেয় একবেলা। খাওয়া ভালো না। তবে ঘোড়ার খাদ্য ডাল দিয়ে পেট ভরানো চলে। আমার মা আমাকে দেখতে আসেন। আমিই তার সঙ্গে দেখা করি না। মশার কামড় অবশ্য সহ্য হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ

মা আমাকে উকিল দিলেন আমি সেই ওকালতনামায় স্বাক্ষর করি নাই। কিন্তু আমার যেদিনই ডেট পড়ত আদালতে, সেই উকিল হাজির হতো। কাবেরির সাথেও তার যোগাযোগ ছিল আমার মামলা বেশি জটিল ছিল না।

আমার উকিল সাহেব আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তুমি বলবা তুমি খুন করো নাই। তুমি বলবা, কে খুন করেছে তুমি জানো না। তুমি বলবা, হয়তো আসলাম রিকশাওয়ালা তাকে খুন করেছে। তুমি বলবা, তুমি নিয়মকানুন জানতা না। তোমার বন্ধুর পেট থেকে ছুরি বের করে খবর দেওয়ার জন্য তুমি থানায় গেছলা। তখন পুলিশ তোমাকে আটকে ফেলে। বলে, তুই-ই খুন করেছিস। আমিও বোকা ছিলাম, ছুরিটা ধরে এসেছি। ফলে ছুরিতে আমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা করেন, এটাতে আসলামের আঙুলের ছাপও আছে। এটা থাকবেই। কারণ ছুরিটা তো আসলামের। সে নিশ্চয়ই সেটা অনেকবার হাতে ধরেছে।

আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলি। বলি যে, আমিই খুন করেছি রাশেদকে। রাশেদ আমার অনেক দিনের বন্ধু। ক্লাস নাইন থেকে আমরা একই সঙ্গে সিগারেট খাই। একই সঙ্গে গাঁজা ধরি। কিন্তু রাশেদকে আমি খুন করি। কারণ, সে আমার গার্লফ্রেন্ডকে রেইপ করার চেষ্টা করে। আমার মাকে সে খানকি বলেছিল, এই কথাটা আমি চেপে যাই। পত্রপত্রিকায় এই কথা লেখালেখি হোক, সেটা আমি চাই নাই।

আমার উকিল আমাকে জেরা করেন।

তিনি বলেন, যখন আপনি খুন করেন, তখন আপনি কি স্বাভাবিক ছিলেন, নাকি নেশা করা অবস্থায় ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, আমি তখন ফেনসিডিল খাওয়া অবস্থায় ছিলাম।

এই অবস্থায় আপনি যে তাকে খুন করেছেন, এটা তো পরে আপনার মনে থাকার কথা নয়।

আমি বলি, আমার মনে আছে। সত্য বটে, ফেনসি খাওয়া না থাকলে আমি হয়তো রাশেদকে খুন করতাম না। কিন্তু আমিই তাকে খুন করেছি। আর এ জন্য আমার ফাঁসিই হওয়া উচিত।

আপনার শাস্তি কী হওয়া উচিত, এটা মাননীয় বিজ্ঞ আদালতই স্থির করবেন। মুখের থুতু মুছে তিনি বলেন, আপনি তাকে খুন করার উদ্দেশ্যে আঘাত করেন নাই।

না, আমি তাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই আঘাত করি।

তাহলে আপনার অনুতাপ হলো কেন? কেন আপনি থানায় দৌড়ে এলেন?

আমি খুন করেছি। আমার তো শাস্তি হওয়াই উচিত। তাই না?

আচ্ছা আপনি রাশেদকে খুন করার কথা কত দিন আগে থেকে পরিকল্পনা করেছিলেন?

আমি পরিকল্পনা করি নাই। হঠাৎই সামনে দেখলাম ছুরিটা। ওটা দিয়ে আমি তাকে খুন করার কথা তখনই ভাবলাম।

উকিল সাহেব বললেন, মাননীয় আদালত, আমার এইটাই পয়েন্ট। আমার আসামির বয়স তখন ছিল আঠারো। (সার্টিফিকেটে আমার বয়স এক বছর কমানো)। সে তখন নেশা করা অবস্থায় ছিল। সে হঠাৎই মাথা গরম করে এই কাজটা করে ফেলে। ভিকটিম তার জানের দোস্ত ছিল। এই আঘাত করার আগে সে তাকে কখনো আঘাত করে নাই। পরেও সে সোজা থানায় চলে আসে। কাজেই এটা একটা নেহাতই দুর্ঘটনা। একজন কিশোরের এই মিসটেক আমাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মাননীয় আদালত, আজ চারদিকে মাদকের নীল ছোবল। এই রকম একটা কিশোর কেন ফেনসিডিলের মতো নেশার দংশনে নীল হয়ে গেল, তার কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কেন এই সমস্ত ড্রাগস এত সহজপ্রাপ্য?

উকিল সাহেব খুবই আবেগপ্রবণ একটা ভাষণ দেন।

অনেক দিন ধরেই বিচার চলে। আমার একজন সাক্ষী ছিল কাবেরি। প্রথম কিছুদিন সে তারিখে তারিখে আদালতে আসে। তারপর আসা বন্ধ করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার উকিল বলেন, তার পরিবার তাকে রিহাবে পাঠিয়েছে। সেখান থেকে তাকে তারা বিদেশে পাঠিয়ে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই খুন আসামি আক্কাস মাহমুদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। ছুরিতে আসামির হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, আর ভিকটিমের হাতের মুঠোতেও যে চুল পাওয়া গেছে, তা আসামি আক্কাস মাহমুদেরই। তিনি নিজে সবকিছু স্বীকারও করেছেন।

আসামির বয়স, অপরাধ সংঘটনের সময় তার মানসিক অবস্থা, অপরাধ সংঘটনের মোটিভ, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অনুপস্থিতি–সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আক্কাস মাহমুদের ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হলো।

বিচারক এই রায় দিলে আমি আহত হই। আমি এই জীবন রাখতে চাই না। ফাঁসিই আমার কাম্য ছিল।

আদালতে নেশার উপকরণ পাওয়া খুব কষ্ট। তবে গাঁজাটা নিয়মিতই পাওয়া যায়। হাজতি থেকে কয়েদি হওয়ার পর আমাকে ঢাকা থেকে বদলি করে দেওয়া হয় রংপুর কারাগারে।

কারাগারে আমার দোস্তি হয় দুজনের সঙ্গে। একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত আসগার। তিনি ছয়টা খুনের মামলার আসামি। একটা ডাকাতির মামলায় তার ছয় বছরের জেল হয়েছে। আরেকজন সর্বহারা পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর নাম কমরেড হারুন। কমরেড হারুনও তাঁর সহকর্মী কমরেড নিতাইকে খুন করেছেন। তবে তাঁর শাস্তি হয়েছে ব্যাংক ডাকাতির মামলায়। আরেকটা মামলায় বিচার চলছে।

আসগার ডাকাত দিলদরিয়া মানুষ। জেলে এসে দাড়ি রেখেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। ভোরে উঠে কোরআন শরিফ পড়েন।

কমরেড হারুন উল্টো। রোজ সকালে দাড়ি কামান। পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরেন। তারপর তিনি লাইব্রেরি থেকে আনা বই পড়তে থাকেন। এখন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি বই পড়ছেন। *প্রিজন নোটবুক।* অ্যান্টোনিও গ্রামসির লেখা। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, তার মানে এই নয় মার্ক্সবাদ মিথ্যা হয়ে গেছে। মার্ক্সবাদকে যান্ত্রিকভাবে দেখলে চলবে না। মানুষ যন্ত্র নয়। মানুষ বস্তুও নয়। কমরেড হারুনের নামে বাইরে থেকে 'দেখা' এলে তিনি শুধু বই চেয়ে পাঠান। তাঁর নামে কোনো খাবার আসে না।

আসগর ডাকাতের নামে 'দেখা' এলে আমাদের আনন্দ ধরে না। কারণ ভালো ভালো খাবার আসে। তিনি আমাদের সবাইকে দিয়ে থুয়ে খান।

তাঁদের দুজনের দুজন ফালতু আছে।

আমাকেও ফালতু হিসেবে একজন রাজবন্দীর খেদমতে দেওয়া হয়। আমি তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করি। তিনি আমাকে ফালতু হিসেবে নিতে অস্বীকার করেন। উল্টো জেলারকে বলেন, আকাশের সেবা করার জন্য একজন ফালতু দেওয়া হোক।

আমি জেলখানার ভেতরে বাগান করি।

মাঝেমধ্যে জেলখানার চার দেয়ালের বাইরেও কাজ করার জন্য আমাকে নেওয়া হয়। তখন আমার হাতে হাতকড়া থাকে।

আমি কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই।

এবার শীতে আমরা শর্ষে করলাম জেলখানার পেছনের জমিতে।

রংপুরের বিখ্যাত শীতের সকালে কুয়াশার মধ্যে যখন রোদ ওঠে, তখন আমাদের হলুদ শর্ষেখেতটাকে একটা স্বর্গের বাগানের মতো দেখায়।

সেই বাগানে কাজ করতে করতে সামনের মেডিকেল হাসপাতালটাকে দেখি। রোগী আসে অ্যাম্বুলেন্সে। তাদের আত্মীয়স্বজন আসে রিকশায়। সামনে ফলের দোকান।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রথমে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখনই আমার 'বেড়া' ওঠে। আমি নেশার জন্য পাগল হয়ে উঠি। আমার শরীর বেঁকে যেতে থাকে। জেলখানার ডাক্তার ছুটে আসেন। তিনি বলেন, সমস্যা কী? আমি বলি, ফেনসিডিল দেন। নাইলে মইরা যাব।

তিনি আমাকে ব্লকার দেন।

ঢাকা জেলখানায় নেশাসক্ত হাজতি, কয়েদি প্রায়ই আসে। তাদের চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে, ডাক্তাররা জানেন। কাজেই অনেক মাদকাসক্ত জেলখানায় এসে সেরে যায়। তাদের রিহ্যাব হয়ে যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাদকমুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ জেলখানায় এসে মাদকাসক্ত হয়ে ফিরে যায়। এখানে সব ধরনের নেশার উপকরণই ঢোকে।

আমি ঢাকা জেলেই সেরে যেতে পারতাম, কারণ ডাক্তার আমাকে ড্রাগসরোধী ওষুধ দিতেন। সেটা আমার চামড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু আমি যে পণ করেছি আমি সারব না। আমার এই জীবনের কোনো মূল্য নাই। এই জগতে তো আমার আপন বলতে কেউ নাই। একমাত্র আছে মা, তাকে আমি ঘৃণা করি। তার জন্যই আমার জীবনে এত দুঃখ, এত কষ্ট।

আমি কেন বাঁচব?

আমি কেন সেরে উঠব?

কাবেরি কানাডা চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ঢাকা জেলেই। আমাকে বলে, আমি চলে যাচ্ছি।

আমি বলি, ভালো তো।

তুমি আমার উপরে রাগ রাইখো না।

রাগ কেন রাখব?

এই যে তোমারে ছাইড়া চইলা যাইতাছি, আবার তোমার কেসে সাক্ষী দিতে আসি না, এই কারণে রাগ থাকতে পারে না।

পাগল। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। এখন আমি পাগলামো কইরা জেলে চইলা আসছি। রাশেদও নাই। তুমি থাকবা কেমনে দেশে। সেই ভালো। বিদেশ যাও। নেশা ভাং ছাড়ো। সুন্দরভাবে বাঁচো।

আমি আবার আসব। কানাডায় গিয়া অ্যাডমিশন নিব। পড়া শেষ কইরা দেশে আসব। আইসা তোমারে জেল থাইকা বাইর করব। তারপর দুইজনে সংসার করব।

আচ্ছা। তোমার আসতে ইচ্ছা হইলে আসবা।

একটা বাবু নিব। মেয়ে বাবু হইলে তার নাম দিব তোমার মায়ের নামে। সাবিহা বেগম।

কাবেরি চলে যায়। আর কোনো দিন তার সঙ্গে দেখা হয় না, ভবিষ্যতে হবে বলে মনেও হয় না।

মা জেলখানায় আসতেন। আমি তার সাথে দেখা করতাম না। মা খাবার-দাবার, বই রেখে চলে যেতেন।

একদিন দেখি তিনি রেখে গেছেন আমার ছোটবেলার বইটা। বাণিজ্যেতে *যাব আমি।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটা পুরোনো হয়ে গেছে। তবে পৃষ্ঠা সব ঠিকঠাক আছে। আশরাফ সিদ্দিকীর লেখা একটা বড় কবিতার বই। বাচ্চাদের কবিতা।

সেই বইটা হাতে নিয়ে আমার কেমন যেন লাগে।

আমার ওয়ারির বাড়ির কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে সেই বই বাঁধাইয়ের কারিগরটার কথা। তিনিই এই বই আমাকে দিয়েছিলেন।

রংপুর জেলে আমি সেই বইটা নিয়ে এসেছি।

একদিন একটা চিঠি এল। মার চিঠি। মা ঢাকা জেলের ঠিকানাতেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। রংপুর জেলে সেই চিঠি নানা হাত ঘুরে ঠিকই চলে এসেছে।

আমি সেই চিঠি খুলি।

মা এসব কী লিখেছেন।

বাবা আকাশ। আশা করি ভালো আছিস। কালকে আমার কাছে অফার এসেছে, আমাকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট করবে। আমি বলেছি, আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হব না। আমি পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হব। তুই চিন্তা করিস না।

একটা জাহাজ কেনার কথা হচ্ছে। জাহাজটা পেলেই আমি তোকে নিতে চলে আসব। তোর নানাবাড়ির পাশেই কীর্তনখোলা নদী, তোর মনে আছে? মনে থাকবেই বা কী করে, সেই নদী তো তুই কখনো দেখিসনি। তুই যখন আমার পেটে ৫ মাস, তখন আমরা কীর্তনখোলা নদী বেয়ে স্টিমারে চড়ে ঢাকা চলে আসি। আর তোকে কোনো দিনও নানাবাড়ি নেই নাই। তোর নানাবাড়ি ইটসুড়কির বিল্ডিং। ছাদের খোপে অনেক পায়রা।

বাক বাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি
পরবে সোনার পালকি।

মার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এই জীবনের কোনো মানে নাই।

আমার কিছু ভালো লাগে না। আমার মনে হয়, আমি আত্মহত্যা করব।

ডেপুটি জেলার বলেন, আকাশ, তোমাকে ছাড়া হবে শিগগিরই। তোমার আচার-আচরণ ভালো। সামনের ঈদে কি স্বাধীনতা দিবসেই তোমাকে ছেড়ে দিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি, আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি যাব না। আমি কই যাব? বাইরে আমার যে কেউ নাই। জেলে তো তবু কতজন আছে। আপনারাই এখন আমার আপনজন। আমার এখানকার কয়েদি বন্ধুরা, হাজতি বন্ধুরা। জেলখানাই আমার বাড়িঘর। বন্দীরাই আমার পরিবার।

মার চিঠি এখনো মাঝেমধ্যে আসে। মা সাভারে একটা অনাথ-বৃদ্ধাশ্রমে আছেন। মা যে খুব বৃদ্ধ তা নয়। তার বয়স এখন বড়জোর ৫৪। তবু তিনি আশ্রমেই থাকেন। কে যে তাকে দয়া করে এই আশ্রমে দিয়েছে আমি জানি না।

এখন জেলখানার ভেতরেও মোবাইল ফোনে কথা বলা যায়। মারও মোবাইল ফোনের একটা নম্বর আছে। মা চিঠিতে সেই নম্বরটা আমাকে দিয়েছেন।

কী মনে হলো, একদিন ফোন করি সেই মোবাইল ফোনের নম্বরে।

হ্যালো... ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর।

আমি বলি, সাবিহা বেগম কি আছেন? আপনাদের এখানে ১২৯ নম্বর রুমে থাকেন। ওনাকে পাওয়া যাবে?

আপনি ছাড়েন। ওনারে ধইরা আমি মিস্‌ড কল দিব। তখন আপনি আবার ফোন কইরেন।

মিনিট পাঁচেক পরে কল আসে। আমি কেটে দিই। ফোন করি। আমার হাতের মোবাইল ফোনটাও আমার না। আমাদের জেলে একজন এমপির ছেলে এসেছে। তার ফোন। আমি তার কাছ থেকে নিয়েছি একটু ব্যবহার করব বলে।

হ্যালো... মার গলা।

মা। আমি আকাশ।

বাবা আকাশ তুই কেমন আছিস?

আমি ভালো আছি মা। তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো আছি। মাঝেমধ্যে তোকে স্বপ্ন দেখি। তখন খুব ভালো থাকি।

তোমার শরীর কেমন আছে। কোনো অসুখবিসুখ নাই তো?

না। তোর শরীর ভালো আছে? জেলে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো দেয়?

দেয় মা। বাইরে থেকেও খাবার আসে। সব পাওয়া যায়।

আমি তোকে দেখতে যেতে চাই বাবা। আমার সাথে দেখা করবি?

আমি ফোন কেটে দিই। মা আমাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। আমার দুর্বল হওয়া চলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানায় গাঁজা কোথায় পাওয়া যাবে। বহুদিন গাঁজা খাই না। আজকে খেতে হবে। আজকে আমার মনটা উতলা।

আমি জানি, কে গাঁজা দিতে পারে। কোন জমাদার। কিন্তু টাকা খরচ করতে হবে। এমপি সাহেবের লাল্টু পোলার পা টিপে দিলে গাঁজার টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

গাঁজা জোগাড় হয়েছে। আমি লাল্টুকে সাধি। ওকে গাঁজা ধরিয়ে দিতে পারলে আমার আর গাঁজার টাকার চিন্তা থাকবে না। গাঁজা কখনো একা বসে খাওয়া যায় না। গাঁজা খেতে দল লাগে। সঙ্গ লাগে। এই লাল্টুকে একবার গাঁজার মজা ধরিয়ে দিতে পারলে আর কোনো চিন্তাই নাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোলো

কোকিল ডাকছে কুহুকুহু। বসন্তকাল এসে গেছে। জেলখানার পাঁচিলের বাইরে আমগাছে আমের মুকুল। তাই তো। তাহলে এটা ফাল্গুন মাস

আমি পাঁচিলের ভেতর থেকেই বাইরের আমগাছের দিকে তাকাই। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। জেলখানার ভেতরে এই বিকেলবেলা আমার শরীরে এই বাতাস আনন্দের এক প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

আমি গাছের মুকুলের শোভা দেখি। কোকিলটা ঠিক কোন ডালে বসে আছে, বোঝার চেষ্টা করি। তারপর আমার চোখ চলে যায় দেয়াল দিয়ে ঘেরা আকাশটার দিকে। নীল আকাশ। এক টুকরা সাদা মেঘ।

আর ওটা কী? চাঁদ। এই দিনের বেলা একটা আধখানা চাঁদ। আশ্চর্য। আকাশের গায়ে এখন রোদ। সাদা মেঘ। পাশে একটা চাঁদ। একই আকাশে সূর্য আর চাঁদ থাকে। কী সুন্দর। কী সুন্দর।

আমি মুগ্ধ চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কোকিল ডেকেই চলেছে কুহুকুহু।

তখন 'লাগবে চুড়ি ফিতা আয়না চিরুনি' বলে একটা ফেরিওয়ালা ডেকে ওঠে। এই পড়ন্ত বিকেলে জেলখানার সবাই প্রায় ঘুমুচ্ছে। কী এক অপার্থিব নীরবতা। এর মধ্যে আলো, এর মধ্যে আমের গাছে মুকুল, তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধ, নীল আকাশ, সাদা মেঘ, আর আধাখানা চাঁদ, আর কোকিলের ডাক আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা ফেরিওয়ালার চুড়ি ফিতা হাঁক। আমার মন কেমন করে। আমার মন হেঁটে চলে ওই ফেরিওয়ালার সঙ্গে। কোন প্রান্তরে হাঁটবে এই ফেরিওয়ালা? যাবে কোন দিগন্ত পেরিয়ে? হয়তো মাঠের মধ্যে একটা সরু পায়ে চলা পথ। দুধারে চোরকাঁটা। সেই পথ গিয়ে শেষ হয়েছে একটা মাটির ঘরে। সেখানে ফেরিওয়ালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউ অপেক্ষা করে আছে সবুজ রঙের শাড়ি পরে। হয়তো তার দুবছরের বাচ্চার কোমরে ঘুঙুর। সে বাচ্চাটাকে কোলে নেবে। বাচ্চা বলবে, বাবা, ঝুমঝুমি। বাচ্চার মা বলবে, ওটা নিতে হয় না বাবা। ওটা বাবা বিক্রির জন্য নিয়ে বেড়াচ্ছে। ফেরিওয়ালা বলবে, আচ্ছা একটা ঝুমঝুমিই তো। খোকাকে দাও ওটা।

বাব্বা, তোমার ছেলের জন্য এত টান? আমার জন্য তো কোনো দিন তোমার পসরা থেকে কিছুই দিলে না?

আচ্ছা। তোমাকে আজ দেব আলতা। দেখি তোমার পা দুখানা। ফেরিওয়ালা বসে আঙিনায়। পিঁড়ি পেতে। তার বউ তাকে পা দুটো এগিয়ে দেয়। ফেরিওয়ালা তার বউয়ের পায়ের সাদা পাতায় লাল আলতা মেখে দেয়। তার খোকা তখন ঝুমঝুমি হাতে নাচছে। ঝুমঝুম...

উফ। জীবন এত সুন্দর কেন?

হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।

আমার মা আমাকে অ্যাবরশন করে ফেলে দেননি বলেই আজকের এই সুন্দর জীবনটা আমি পেয়েছি। দুপুরবেলা আজ গোসল করেও কত মজা লাগল। সবাই মিলে ড্রেনের পানি থেকে কৌটা ধরে মাথায় ঢালা। এই তো গোসল। তবুও দখিনা বাতাস যখন ভেজা চুলে লাগছিল, তখন আরাম বোধ হলো। গত রাতে খাওয়া হয়েছে ইলিশ মাছ। দেখা এসেছিল এক কয়েদির, সেখান থেকে খাবার এসেছে। ইলিশের একটা পেটি ভাগে পড়েছে। পেটে এত তেল। মুখে দিয়ে মনে হলো অমৃত।

জীবন। জয়শ্রী জীবন। কী সুন্দর জীবন। মা, থ্যাংক ইউ, মা। তুমি আমাকে জীবন দান করেছ। আহা রে আমার চিরদুঃখিনী মা। আমাকে পেটে ধরে তার কত কষ্ট। কত গঞ্জনা। কত কলঙ্ক। কত অপমান। সবাই বলল, খালাস করো। এ আর এমন কী। মা, তুমি খালাস করলে না। তুমি বললে, আমি বাচ্চা রাখব। আমি কোনো অন্যায় করিনি। যাকে ভালোবেসেছি, তার সঙ্গেই ভালোবাসা করেছি। তাকে তো আমি আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে বিয়েও করেছি। যদি মন্ত্র সত্য হয়, তবে আমি তো বিয়ের মন্ত্র পড়েওছি। আমার বাচ্চার কোনো দোষ নাই। কোনো অপরাধ নাই। পাপও যদি হয়ে থাকে, তবে সে আমার পাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, তুমি বাবার জন্য অপেক্ষা করেছ। তোমার ধারণা ছিল, বাবা তোমাকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারবেন না। তোমার কাছে তিনি আসবেন। একদিন না একদিন।

কিন্তু বাবা কোনো দিনও আসেননি। তুমি আমাকে পেটে নিয়ে ঢাকা এসেছ। স্কুলে কাজ নিয়েছ। তারপর নানা কুকথায় তোমার স্কুলের চাকরি গেছে। তুমি এনজিওতে জয়েন করেছ। আমাকে স্কুলে পড়িয়েছ। কলেজে পড়ানোর চেষ্টা করেছ।

বরিশালের মেয়ে হয়ে তুমি এমন মনের জোর কোথায় পেলে বলো তো? অবশ্য তুমি বিএম কলেজের মাস্টার্স। তোমার তো শিক্ষা ছিল। শিক্ষার অহংকার ছিল।

তোমার বাড়ির কেউ তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেনি। তারা প্রচার করেছে যে তুমি মরে গেছো।

শুধু মাঝেমধ্যে গোপনে তোমার মা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

মা, আমি আর নেশা করব না। আমার মুক্তির দিন সমাগত। আমি তোমাকে আশ্রমে থাকতে দেব না মা। আমি আসছি।

আমরা একটা বাসা ভাড়া নেব। আমি আর তুমি সেই বাসায় থাকব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো

রংপুর জেলখানা থেকে আমি যখন বের হই, তখন সন্ধ্যা। মুক্তির কাগজপত্র তৈরি করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। জেলার সাহেব বললেন, আকাশ, তুমি আজকের রাতটা থাকো। কাল সকালে বের হও। রাতের বেলা তুমি কই যাবে? তোমার যাওয়ার জায়গা আছে?

আমি বলি, কয়েক দিন আগে হলে আমি বলতাম, আমি বাইরে যাব না। এখানেই রয়ে যাব। দরকার হলে আরেকটা খুন করে আমি ভেতরে ঢুকব। কিন্তু এখন আমি একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাই না।

কই যাবে?

ঢাকা যাব, স্যার।

ঢাকায় কে আছেন?

আমার মা আছেন। কত দিন মাকে দেখি না! ও।

জেলার সাহেব আমাকে দেখিয়ে দেন কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আমার কোনো জিনিসপত্র নাই। কোনো টাকাপয়সা জমা নাই। জেলখানার পোশাকের বাইরে আমি কী পরব? জেলার সাহেবই আমাকে একটা পরিষ্কার শার্ট আর পরিষ্কার প্যান্ট দেন। আমি সেটা পরে রংপুর কারাগারের ফটকে এসে দাঁড়াই।

আহা! মুক্তি!

আমি এই প্রাঙ্গণে এর আগেও অনেকবার দাঁড়িয়েছি। কাজ করেছি বাগানের। কিন্তু তখন আমার পরনে থাকত জেলখানার কয়েদির পোশাক। আমার হাতে থাকত হাতকড়া। কিন্তু এখন আমার পোশাক সাধারণ মানুষের। মুক্ত মানুষের। আর আমার হাতে কোনো হাতকড়া নাই। কোমরে দড়ি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুকুলের গন্ধমাখা আমগাছের নিচে জমাট অন্ধকার। জেলখানার ফ্লাশলাইট এই জায়গায় এসে পৌঁছেনি। আমের মুকুল ঝরে পড়ে আছে মাটিতে, আহ, কী সুন্দর গন্ধ! আমি ঘাস মাড়িয়ে রাস্তায় আসি। সামনে রংপুর মেডিকেল কলেজ। ওই যে দূরে লাশকাটা ঘর।

আমি একটা রিকশা নেব। লাল্টু আমাকে দুই হাজার টাকা দিয়েছে। সে বলেছে, আমি যেন ঢাকায় তার বাবার সঙ্গে দেখা করি। তার বাবা নওশের আলী এমপি আমাকে একটা কন্ট্রাক্টরি দেবেন। আমি যেন সেই কাজ করি।

আমি রিকশাওয়ালাকে ডাকি, এই যাবেন।

কই যাইবেন।

ঢাকার বাস কোথাইকা ছাড়ে?

কামারপাড়া। যাইবেন?

চলো।

আমি রিকশায় উঠি। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। রংপুর ক্যান্টনমেন্টে অনেক আলো। আমার রিকশা বড় রাস্তা ধরে কামারপাড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে।

নাইট কোচগুলো ছাড়বে রাত দশটায়। আমি টিকিট কিনে ফেলি আগমনী এক্সপ্রেসের। বাসস্ট্যান্ডের রেস্টুরেন্টে বসে ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খাই। আমার ভালো লাগে।

বাসের মধ্যে বসে থেকে উত্তেজনায় আমি ঘুমুতে পারি না। বাসের ড্রাইভার আর আমি জেগে থাকি। বাস চলে। বাসে হিন্দি গান বাজে। এক পরদেশি মেরা দিল লে গেয়া...

বাসের জানালা খুলে দিই সামান্য। মাথা জানালায় রাখি। বাতাসটা খুব আরামদায়ক লাগে।

ভোরবেলা আমি সাভারে নেমে যাই। এখান থেকে মার আশ্রমে যাওয়া আমার জন্য সুবিধাজনক হবে।

এত সুন্দর ভোর আমি জীবনেও দেখিনি। প্রশান্ত ভোর। কী সুন্দর করে গাছপালা আকাশ থেকে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। আলো ফুটে উঠছে। পাখি ডাকছে।

রিকশা নিই। রিকশা চলে। চায়ের দোকানগুলো খুলছে। একটা দোকানের চুলায় বড় কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে।

রাস্তায় কাকের দল বাসি খাবার নিয়ে মারামারি করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার আশ্রমটা একটু ভেতরের দিকে। রাস্তার দুধারে দেয়াল আর দেয়াল। নানা ধরনের কারখানা। সেসব পেরিয়ে একটা আমের বাগান। তারপর মায়ের আশ্রমটা। বাইরে থেকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

আমি আশ্রমে পৌঁছাই। দারোয়ানকে বলি, আমি আমার মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সে আমাকে ভিজিটরস রুম দেখিয়ে দেয়।

ভিজিটরস রুমে দর্শনার্থীদের রেজিস্ট্রি খাতায় সই করে আমি অপেক্ষা করি।

একজন আয়া আমার খবর নিয়ে ভেতরে যান।

খানিকক্ষণ পরে আমি পায়ের আওয়াজ পাই। আমার বুকের মধ্যে শব্দ হচ্ছে, আমি শুনতে পাই।

মা এসে দরজায় দাঁড়ান।

বাইরে অনেক আলো।

আলোর বিপরীতে আমার মাথার চুলগুলো সাদা দেখায়।

মা সাদা একটা শাড়ি পরেছেন। মাথায় আঁচল। চোখে চশমা।

আমি আস্তে করে উঠি। মার হাত ধরি। মাকে ধরে একটা চেয়ারের কাছে এনে বলি, মা, বসো।

এত বুড়ো হয়ে গেছেন মা!

মা বলে, তোকে খুব বড় দেখাচ্ছে আকাশ। তুই বড় হয়ে গেছিস।

আমি বলি, হ্যাঁ মা, আমি বড় হয়ে গেছি। তোমার মনে আছে, তুমি বলতে, তুই বড় হলে আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। কষ্ট থাকবে না। আমি বড় হয়েছি। তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।

আমার কোনো কষ্ট নাই বাবা।

আমারও কোনো কষ্ট নাই মা। মা, আমি একটা কন্ট্রাক্টরির কাজ পেয়ে যাব। কাজটা ধরতে পারলে আমার কোনো অভাব থাকবে না। আমি ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া করব। তোমাকে সেই বাসায় নিয়ে যাব। আমরা মা-ছেলে মিলে সেখানে আরাম করে থাকব।

এদিকে আয়।

আমি মার কাছে যাই। মাকে জড়িয়ে ধরি। আহা, কত দিন পরে আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম। সেই ছোটবেলায় মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতাম। মায়ের গায়ের সেই গন্ধটা আজও আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন ছোটবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার। বাইরে ঝড়ের শব্দ। গুড়ুম গুড়ুম করে দেয়া ডাকছে। আমি বিছানা হাতড়ে দেখি মা নাই। আমি মা মা করে ডাকছি। মার গায়ের চাদরটা পড়ে ছিল বিছানায়। আমি সেই চাদর জড়িয়ে ধরলাম। মায়ের গায়ের গন্ধ আমাকে আশ্বস্ত করল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে জেনেছি মা বাথরুমে গিয়েছিলেন।

আহারে আমার মা। কত বুড়োটে হয়ে গেছেন। অথচ তার বয়স মোটেও বেশি না।

আমি মার কপালে চুমু দিই। মা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মা।

মা বলেন, পাগল ছেলে। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমার কপালে চুমু দেন। চুলে চুমু দেন।

আমার খুব বলতে ইচ্ছা করে, মা, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ যে আমাকে তুমি জন্ম দিয়েছ। মানুষের জীবন দিয়েছ। কুন্তা-বিলাইয়ের জীবন নয়। মানুষের জীবন। আনন্দপূর্ণ জীবন। প্রণোদনাপূর্ণ জীবন। যে জীবনে কত ছোটখাটো আনন্দের জিনিস। আকাশভরা সূর্যতারা। আবার একটা ছোট্ট ঘাসফুল। একটুখানি ঝালমুড়ি। শিশুর হাসি। বৃদ্ধের প্রশ্রয়পূর্ণ করতল। আমি কিছুই বলি না। মার চোখের গরম জল আমার গালে পড়ে।

আমি সেই অশ্রু নিজের চোখে মাখার চেষ্টা করি।

সাভারের আকাশে তখন আলোর বন্যা। ভিজিটরস রুমের জানালা-দরজা উছলে সেই আলোর ধারা ঘরটাকে প্লাবিত করে তোলে। রাজ্যের চড়ুই এসে কিচিরমিচির জুড়ে দেয় চারপাশে।

আমি মার শীর্ণ হাতে আমার আঙুল বোলাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~